বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন

ইউনিট
৯

ভূমিকা:
১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার ভারত স্বাধীনতা আইনের ভিত্তিতে অবিভক্ত ভারতকে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত করেছিল। এই বিভাজনের মূলে ছিল মুহাম্মাদ আলী জিন্নাহর 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব'। কিন্তু ১৯৪০ সালে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের জন্যে একাধিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যে প্রস্তাব লাহোরে গৃহীত হয়েছিল নানা কারণে তা আলোর মুখ দেখেনি। লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়োজন হতো না। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কয়েক মাসের মধ্যেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়, যা চূড়ান্তরূপ লাভ করে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ৫৪'র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, ৬৬'র ছয়দফা আন্দোলন, ৬৯'র গণ-অভ্যুত্থান,৭০'র নির্বাচন এবং ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধিকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ১ ঃ ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ

পাঠ- ২ ঃ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

পাঠ- ৩ ঃ পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি

পাঠ- ৪ ঃ ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি

পাঠ- ৫ ঃ ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা

পাঠ- ৬ ঃ উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান: প্রেক্ষাপট, ঘটনাপ্রবাহ ও গুরুত্ব

পাঠ- ৭ ঃ সত্তরের জাতীয় নির্বাচন

পাঠ- ৮ ঃ বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ

পাঠ- ৯ ঃ মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

পাঠ-৯.১ ভাষা আন্দোলন ও বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- আরো জানতে পারবেন ভাষা আন্দোলনের ঘটনা ও তাৎপর্য

	মূখ্য শব্দ	দ্বি-জাতি তত্ত্ব, ১৪৪ ধারা, একুশে ফেব্রুয়ারি, ও আম তলা

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত ঘটনা। ভাষা আন্দোলন বাংলার মানুষকে মুসলিম লীগের তৎকালীন কর্মকাণ্ড বিশেষ করে ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও দ্বিজাতি তাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার সুযোগ করে দেয়। বাঙালিরা ভালোভাবেই বুঝতে সক্ষম হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ তাদেরকে শোষণের গোলকধাঁধা থেকে বের হতে দেবে না। তারা একে একে বাংলার মানুষকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে শোষণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করবে। যার প্রথম পর্যায় ছিল বাংলাকে বাদ দিয়ে উর্দুকে রাষ্ট্র ভাষা করার প্রস্তাব। ফলে বাঙালিদের আন্দোলন করা ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না। বাংলা ভাষার প্রশ্নে সকল পেশাজীবী মানুষ একই পতাকার ছায়ায় আশ্রয় নেয় এবং আন্দোলন করেই তাদের দাবি প্রতিষ্ঠা করে। এই আত্মজাগরণ ও জাতীয়তাবোধই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক প্রেরণা যুগিয়েছিল।

ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষপট

১৯০৬ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার সময় সংগঠনটির দাপ্তরিক ভাষা কি হবে তা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয়। পরবর্তী পর্যায় দেশ বিভাগের আগে আবার বাংলা বা উর্দু বিতর্ক শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানিরা যেমন উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে প্রচারনা চালায় তেমনি বাংলার জনগণও বিশেষ করে লেখক, বুদ্ধিজীবী এটির বিরোধিতা করে এবং বাংলার পক্ষে প্রচারনা চালায়। গণ আজাদী লীগ, তমুদ্দন মজলিশ, রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ প্রভৃতি সংগঠন সভা সেমিনারসহ সর্বত্র নানাবিধ প্রচারণা চালাতে থাকে।

প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমুখের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে একটি 'পুস্তিকা' প্রকাশ করা হয় এবং তা সর্বস্তরের জনগণের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হয়। প্রচার পত্র বা এই পুস্তিকায় বাংলাকে কেন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত যুক্তি তুলে ধরা হয়। এছাড়াও বিশিষ্টজনেরা যুক্তি দেখান যে, শুধুমাত্র শুধু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করে আইন পাশ হলে তা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বিভিন্ন দিক দিয়ে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। যেমন : রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতিতে বিরূপ ফল পড়বে বলে বুদ্ধিজীবী মহল খুবই উদ্বিগ্ন ছিল। বিশেষজ্ঞ মহলের চিন্তার বড় কারণ ছিল এই যে, যদি তারা অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠী উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষনা করতে সক্ষম হয় তাহলে বাংলাকে শাসন ও শোষণ করা খুবই কঠিন হবে না। কেননা বাংলাভাষী শিক্ষিত যুবকদের উর্দু না শেখার কারণে উচ্চ পদে নিয়োগ দেওয়া না হলে তাদের সারা জীবন গোলামিই করে যেতে হবে। আবার রাজনৈতিক দিক থেকে উর্দু ভাষী নেতারাই আইন পরিষদসহ নানা ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলে বাঙালি নেতৃবৃন্দের কপালে অবহেলা ছাড়া সম্মান পাবার সম্ভাবচনা কমে যাবে। অন্যদিকে দেশের একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা উর্দু হলে সকলকে জাতীয় ভাষায় সংস্কৃতি চর্চার একটি বাধ্যবাধকতা থাকবে। ফলে এদিক দিয়েও বাঙালিরা পিছিয়ে থাকবে। এছাড়াও সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে উর্দু ভাষীরা উচ্চশ্রেণীতে গন্য হবে আর অন্যরা দারুণভাবে অবহেলার শিকার হবে। উপর্যুক্ত যুক্তিতর্ক বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সকলেই বুঝতে সক্ষম হয় যে, বাংলা ভাষাকে অন্তত: অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না করা হলে বাঙালিরা পদে পদে লাঞ্ছিত হবে। ফলে সংগ্রাম বা আন্দোলনের পথ প্রশস্ত থেকে প্রশস্ততর হতে থাকে।

ঘটনাপ্রবাহ: ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে কংগ্রেস দলীয় সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দেন। এটির ঘোরতর বিরোধিতা করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। প্রস্তাবটি পাশ না হওয়ায় বাংলার ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং ১১ মার্চ সারা দেশে ধর্মঘট পালন করে।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ভাষার দাবীতে ১১ মার্চ ধর্মঘটে ভূমিকা রাখে। এদিন পিকেটিং করা অবস্থায় শেখ মুজিবুর রহমান গ্রেফতার হন। এর মাধ্যমেই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জনতা তার কথার প্রতিবাদ জানায়। জিন্নাহ কার্জন হলের একটি বিশেষ সভাতেও একই দাবি করলে ছাত্ররা না, না বলে প্রতিবাদ জানায় এবং সভাস্থল ত্যাগ করে। ১৯৪৮ সালের ১৮ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান ঢাকায় এসে আবারও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার মনোভাব ব্যক্ত করলে ছাত্র সমাজ বিক্ষোভ প্রদর্শণ করে। ১৯৪৯ সালে বাংলাকে আরবী হরফে লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রবল বাধার মুখে তাও বানচাল হয়ে যায়। এরপর আন্দোলনের গতি কমতে থাকে।

কেন্দ্রিয় শহীদ মিনার

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের শেষ ও চুড়ান্ত পর্ব সংগঠিত হয়। ঐ বছরের ২৬ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা হবে, এমন ঘোষণা দিলে ভাষার প্রশ্নে জনরোষ নতুন করে জেগে ওঠে। ছাত্র জনতা আবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সংগ্রামের অংশ হিসেবে ৪ ফেব্রুয়ারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয়। এমনকি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ আবার পুর্নোদ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। অপরদিকে পূর্ব বাংলার নুরুল আমীণ সরকার কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। যার অংশ হিসেবে ২০ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাত থেকে ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। তবে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলেও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ তাদের পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি পালন অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেয়। নানা সংগঠন এই ঘোষণার সঙ্গে একমত পোষণ করে। ২১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার ছাত্র জনতা সুকৌশলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রবেশ করে এবং নানা তর্ক বিতর্ক শেষে ১৪৪ ভঙ্গের পক্ষে সর্বশেষ সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় ১০ জনের একটি করে দল ক্রমান্বয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করবে। ঐ মিছিল রাজপথে বের হলে পুলিশ বাহিনী সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী কিছু ছাত্র ও জনগণকে গ্রেপ্তার করে। জনতার প্রবল, বাধা ও আন্দোলনী মনোভাব দমন করতে পুলিশ লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা নির্বিচারে গুলি চালাতে থাকে। বুলেটের আঘাতে সালাম, রফিক, শফিক, বরকতসহ অনেকে শহীদ হয়। তাদের রক্ত বাঙালিদেরকে আরো দুর্দমনীয় করে তোলে এবং সংগ্রাম আন্দোলন ব্যাপকতর রূপলাভ করলে বাঙালির দাবি উপেক্ষা করতে পারেনি। এমনকি ১৯৫৬ সালে সাংবিধানিকভাবে উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়া হয়।

ফলাফল :

১. ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের জনগনের মধ্যে নব জাতীয় চেতনা তথা বাঙালিদের মধ্যে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটায়। প্রথমবারের মতো তারা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক অধিকার বা স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেতন হয়। এমনকি তারা যে পশ্চিম পাকিস্তানিদের চেয়ে স্বতন্ত্র মনমানসিকতার অধিকারী তা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

২. বাঙালিরা রক্তের বিনিময়ে অধিকার আদায়ের কৌশল রপ্ত করে। এমনকি তারা তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে।

৩. ভাষা আন্দোলনে দেশের বুদ্ধিজীবী সমাজ জনগণের সাথে একাত্ম হয়েছিল বলে সমগ্র জাতিই সংগ্রাম মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়। সকল পেশার লোকেরা মিলিত হলে একটি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা পায়। ফলে জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক চেতনা ও সংহতিবোধের উন্মেষ ঘটে। যার প্রতিফলন ঘটে ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়ের মাধ্যমে। ঐ নির্বাচনে বাংলার মানুষেরা মুসলিম লীগকে চরমভাবে শিক্ষা দেয়।

৪. ভাষা আন্দোলনের পুরোভাগে থেকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল ছাত্র সমাজ। ফলে আন্দোলনে বাঙালিদের বিজয়ী হওয়ায় ঐ ছাত্র সমাজ একটি প্রভাবশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এমনকি ছাত্র, বুদ্ধিজীবী নানা শ্রেণী পেশার লোকদের নিয়ে ঐক্যজোট গঠন করার রীতি গড়ে ওঠে। এরূপ ঐক্যজোট পরবর্তী সময়ের সকল আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পারন করেছিল।

৫. রাজনৈতিক দিক দিয়ে বাংলা ভাষা আন্দোলন বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে এ আন্দোলন থেকে সুদূর প্রসারী প্রভাব পরিলক্ষিত হয় এবং যে কোন জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বাংলার জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয় সংগ্রাম করার মনোবল সাহস ও অনুপ্রেরণা লাভ করে। এমনকি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও বাংলার জনগণ বুকের তাজা রক্ত উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত বোধ করেনি। কারন তারা ঐ ১৯৫২ সালেই বুঝেছিল সাহাসী ও প্রাণ উৎসর্গকারি মনোভাবই তাদেরকে সকল অবিচার অন্যায় ও পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ভাষা আন্দোলন বাঙালিদের মনন ও মগজে এবং শিরায় উপশিরায় অসীম সাহস ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর পৃথিবীর মানচিত্রে যোগ হয় আরেকটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ, বাংলাদেশ। ১৯৯৯ সালের ২৬ নভেম্বর ইউনেস্কোর অধিবেশনে ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করায় আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব বহুগুনে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভাষা আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি ও তাৎপর্য তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ :

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথমদিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ১৯৫১ সালে পাকিস্তানের প্রথম আদমশুমারীতে দেখা যায় যে, মোট জনসংখ্যার ৫৪.৬০% লোকের মাতৃভাষা বাংলা। সুতরাং বাংলাই যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা সেখানে বাংলাকে বাদ দিয়ে ৭.২% মানুষের উর্দু ভাষাকে বাঙালিদের উপর চাপিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত বাঙালি মেনে নিতে পারেনি। ফলে শুরু হয় আন্দোলন যা চূড়ান্তরূপ লাভ করে ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে। এই দিন ভাষা সংগ্রামীরা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে আবদুস সালাম, আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন, আবদুল জব্বার ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে এটি ছিল বাঙালিদের প্রথম বিদ্রোহ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ভাষা আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত হয় কত সালে?
ক) ১৯৪৫ খ) ১৯৫০ গ) ১৯৪৮ ঘ) ১৯৫২

২. ভাষা আন্দোলনের সময় পূর্বপাকিস্তানের শতকরা কত ভাগ মানুষের ভাষা ছিল বাংলা?
ক) ৫৬% খ) ৫২.৫৪% গ) ৫৪.৬০% ঘ) ৪৯%

৩. কত সালে ২১ ফেব্রুয়ারি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে?
ক) ১৯৯৯ খ) ১৯৯৬ গ) ২০০১ ঘ) ১৯৯৭

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

X একটি সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশ যার সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মাতৃভাষা বাংলা। কিন্তু শাসকশ্রেণীর মাতৃভাষা উর্দু হওয়ায় তারা উর্দকেই X এর রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘাত দেখা দেয়। শাসকশ্রেণী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যাবহার করে আন্দোলনকারীদের উপর গুলি চালালে আন্দোলনকারীদের মধ্যে চারজন ঘটনাস্থলেই নিহত হন।

ক. ভাষা আন্দোলনের কী? ১
খ. ভাষা আন্দোলনে নিহত চারজন ভাষা শহীদেও নাম লিখুন ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ভাষা আন্দোলনেরপটভূমি ও ঘটনা সম্পর্কে লিখুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরুণ? ৪

পাঠ-৯.২ ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভাষা আন্দোলন পরবর্তী জাতীয় রাজনীতি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- ১৯৫৪ সালের নির্বাচন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন ও
- ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণনা দিতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ	**ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট, মুসলিম লীগ, ২১ দফা ও নির্বাচনী ইস্তেহার**

ভূমিকা

১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচন এবং যুক্তফ্রন্টের বিপুল ভোটে বিজয় ছিল পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা তথা স্বাধীন সার্বভৌম দেশ গড়ার একটি পূর্বাভাষ মাত্র। দেশ বিভাগের পরপরই ভাষার প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানিদের মনোভাব বাংলার মানুষকে চরমভাবে ব্যথিত করেছিল। যার প্রভাব পরিলক্ষিত হয় নির্বাচনে মুসলিম লীগের চরম ভরাডুবির মাধ্যমে। এজন্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমন্ডিত।

পটভূমি:দেশ বিভাগের পরপরই নানাবিধ কারণে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি মনোভাব নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানিদের ঘৃণ্য চেহারা প্রকাশ পেতে থাকে। এই অন্যায় অবিচার থেকে মুক্তি পেতে পূর্ব পাকিস্তানের নানা সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিকশিত থাকে এবং নানা রকম দল গঠিত হতে থাকে। রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামী, পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস। পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক নির্বাচন করার সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা ১৯৫১ সালে থাকলেও নানাবিধ কারণে সরকার নির্বাচন আয়োজন করতে পারেনি। তবে ১৯৪৯ সালের একটি উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের পরাজয়কে অনেকে এ দলটি অবস্থানের শুরু হিসেবে দেখেছিল। যাই হোক ১৯৫৩ সালে সংবিধানের ধারা সংশোধন করে ১৯৫৪ সালের ৮ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়।

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলও কর্মসূচি:

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশগ্রহনকারী দলগুলোর মধ্যে মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামী, খেলাফতে রব্বানী পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, গণতান্ত্রিক দল, যুবলীগ প্রভৃতি। আবার অমুসলমান প্রধান আসনগুলোতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেস, তফসিলি জাতি ফেডারেশন, পূর্ব পাকিস্তান সমাজতন্ত্রী দল, গণ সমিতি, কুমিল্লার অভয় আশ্রম প্রভৃতি। তবে একথা ঠিক যে, ভাষা নিয়ে তর্ক ও আন্দোলন সংগ্রাম প্রভৃতি কারণে পূর্ব পাকিস্তান প্রদেশের জনগণ চরমভাবে মুসলিম লীগ বিরোধি হয়ে ওঠে এবং যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যদলগুলো মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অঘোষিতভাবে অবস্থান নেয়। আর সরাসরি বিরোধিতা করার জন্য আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজাম-ই-ইসলামী এবং বামপন্থী গণতন্ত্রী দল সম্মিলিতভাবে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। এই দলগুলোর নেতৃত্বে ছিলেন যথাক্রমে মাওলানা ভাসানী, এ, কে ফজলুল হক, মাওলানা আতাহার আলী এবং হাজী দানেশ প্রমুখ। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক হিসেবে 'নৌকা' গৃহীত হয়। নির্বাচনের জন্য এই যুক্তফ্রন্ট তাদের 'ইশতেহার' প্রকাশ করে যার ভিত্তি ছিল জাতীয়তাবাদী চেতনা ও জাতীয় স্বার্থ রক্ষা। ইশতেহারে ২১ দফা ঘোষণা করা হয়। যথা-

১. পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে 'বাংলা'র স্বীকৃতি দেয়া হবে।

২. কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ ছাড়া জমিদারি ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হবে। উচ্চহারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হবে এবং সার্টিফিকেট যোগে খাজনা আদায় বাতিল করা হবে।
৩. মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলে সংঘঠিত পাট কেলেংকারির সুষ্ঠ তদন্ত ও শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে এবং পাট শিল্পকে জাতীয়করণ করা হবে।
৪. সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে কৃষির উন্নতির বিধান করা হবে এবং সর্বপ্রকার কুটির ও হস্তশিল্পে সরকারি সাহায্য বৃদ্ধি করা হবে।
৫. লবণ কেলেংকারির তদন্ত ও শাস্তি বিধান করা হবে এবং বৃহৎ লবণ শোধণাগার কারখানা স্থাপন করা হবে।
৬. শিল্প ও কারিগরি শ্রেণীর গরিব মোহাজেরদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে।
৭. বন্যা ও দুর্ভিক্ষে ক্ষয়ক্ষতি প্রশমনের জন্য খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটানো হবে।
৮. আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিক অর্থনৈতিক; সামাজিক সংপ্রকার অধিকার নিশ্চিত করা হবে এবং শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী বা স্বনির্ভর করে গড়ে তোলা হবে।
৯. অবৈতনিক এবং বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হবে এবং শিক্ষকদের বেতনভাতার ব্যবস্থা করা হবে।
১০. বৈজ্ঞানিক ও কার্যকরী উপায়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হবে।
১১. বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা হবে এবং উচ্চ শিক্ষাকে সহজলভ্য হিসেবে ব্যবস্থা করা হবে।
১২. সরকারি কর্মচারীদের পর্যায়ভেদে বেতনের সামঞ্জস্যতার বিধান করা হবে এবং যথাসম্ভব শাসন ব্যয় কমানো হবে।
১৩. স্বজনপ্রীতি, ঘুষ ও দুর্নীতি বন্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
১৪. বিনা বিচারে আটক বন্দিকে মুক্তি দেয়া হবে এবং জননিরাপত্তা আইন সংশোধন ও পরিমার্জন করা হবে।
১৫. শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে স্বাধীন করা হবে।
১৬. শাসন ব্যয় কমানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন বর্ধমান হাউজ থেকে সরিয়ে কম বিলাসপূর্ন জায়গায় স্থানান্তর করা হবে এবং এটি ছাত্রাবাসে পরিণত করা হবে এবং পরবর্তীতে এখানে বাংলা ভাষা গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হবে।
১৭. ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি যারা ভাষার জন্য জীবন দিয়েছে তাদের পরিবারের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে এবং ঐ ঘটনাস্থলে শহীদ মিনার নির্মিত হবে।
১৮. ২১ ফেব্রুয়ারি ‘শহীদ দিবস’ ঘোষণা করা হবে এবং প্রতিবছর এই দিনটি সরকারিভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হবে।
১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করা হবে। দেশের সার্বিক নিরাপত্তা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা প্রবর্তন ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষমতা প্রদেশে বিভাজিত করা হবে। এমনকি অস্ত্রশস্ত্রে বলিয়ান হতে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন করা হবে।
২০. যুক্তফ্রন্ট সরকার কোন অবস্থাতেই তাদের কার্যকাল অনির্বাচিত ও অবৈধভাবে বৃদ্ধি করবে না। যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য যথাসম্ভব প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকবে।
২১. মন্ত্রিসভা কোন আসন শূন্য হলে ৩ মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করবে এবং পরপর তিনটি উপ-নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করবে। যুক্তফ্রন্টের মতই মুসলিম লীগ ও তাদের নির্বাচনি ইশতেহার ঘোষণা করে। ইশতেহারে কোরআন ও সুন্নাহভিত্তিক শাসনতন্ত্র প্রনয়ন, মসজিদে ইসলামী শিক্ষাদান ব্যবস্থা প্রণয়ন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাধ্যতামূরক কোরআন শিক্ষা প্রবর্তন করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। এছাড়াও কৃষি, জননিরাপত্তা, পাটশিল্প প্রভৃতির সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেয়া হলেও সুনির্দিষ্ট কোন প্রস্তাব দেয়া হয়নি। মুসলিম লীগের প্রচারকৌশলে দুটি শ্লোগান ছিল তা হলো-‘বিপন্ন মুসলিম’, ‘বিপন্ন পাকিস্তান’। উল্লেখ্য মুসলিম লীগের তুলনায় যুক্তফ্রন্ট তাদের ইশতেহারে সুনির্দিষ্টভাবে কর্মসূচি ঘোষণা করায় এবং সর্বোপরি বাংলার স্বায়ত্বশাসনের উল্লেখ থাকায় জনগণ তাদেরকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দেয়।

নির্বাচনের ফলাফল: ১৯৫৪ সালের ১১ মার্চ প্রাদেশিক আইনসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে সর্বমোট ৩০৯ আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২৩৬টি আসনে জয়যুক্ত হয়। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি আসন পায়। এছাড়াও বাকী আসনগুলোর মধ্যে কংগ্রেস ২৪টি, তফসিলি ফেডারেশন ৪টি, খেলাফত-ই-রব্বানী ১টি, স্বতন্ত্র প্রার্থী ৩ আসন লাভ করে।

যুক্তফ্রন্টের বিজয় ও মুসলিম লীগের পরাজয়ের কারণ:

১. ভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগ পূর্বপাকিস্তানের লোকদের চরম ক্ষোভের সম্মুখীন হন।
২. পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শোষণমুক্ত ও প্রাদেশিক স্বাধিকার প্রাপ্তির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে ইশতেহারে দেখতে পেয়েছিল। ফলে তারা নিরঙ্কুশ সমর্থনে কার্পন্য করেনি।
৩. মুসলিম লীগের নির্বাচনি ইশতেহার জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। কেননা তাদের একমাত্র বক্তব্য ছিল ইসলামী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন। গণমুখী কোন ইস্যু না থাকায় নির্বাচনের আগেই জনগণ কর্তৃক তাদের ইশতেহার প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।
৪. কৃষক, শ্রমিক সর্বোপরি মেহনতি মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন যুক্তফ্রন্টের ইশতেহারে বিদ্যমান ছিল।
৫. ইশতেহারে সদ্য সংগঠিত ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের সনির্দিষ্ট কর্মসূচি বাংলার মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। অন্যদিকে মুসলিম লীগ বাংলার ভাষা আন্দোলন 'দেশদ্রোহী' আন্দোলনের সাথে তুলনা করায় তা প্রত্যাখ্যাত হয়।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

১. দেশ বিভাগের অনেক আগ থেকেই মুসলিম লীগ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু এই নির্বাচনে ভরাডুবির পর তাদের সেই কর্তৃত্বের অবসান ঘটে।
২. গণপরিষদের মুসলিম লীগ দলীয় বাঙালি সদস্যরা পূর্ব- পাকিস্তান প্রদেশের সত্যিকারের প্রতিনিধি নন বলে প্রমাণিত হয়।
৩. এ নির্বাচনে প্রাদেশিক স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি বাঙালিদের অকুণ্ঠ সমর্থন রয়েছে বলে সন্দেহতীতভাবে প্রমাণিত হয়। ফলে জাতীয়তাবোধ ক্রমশ জোরদার হতে থাকে।
৪. পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাজনীতিতে ব্যাপক প্রভাব পরিলক্ষিত হয় বিশেষ করে যথাযথ ও কর্মঠ বিরোধীদলের বিকাশ শুরু হয়।
৫. এই নির্বাচনে একাধিক তুলনামূলক ক্ষুদ্র দলগুলো মিলে যে জোট গঠনের রীতি প্রচলন করে তা আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিকশিত। যেমন- ২০ দলীয় জোট, ১৪ দলীয় মহাজোট পভৃতি।

উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসেই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসেন। কিন্তু শিল্প এলাকায় দাঙ্গা শুরু হলে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার অজুহাতে পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার ১৯৫৪ সালের ২৯ মে ফজলুল হক মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেন। তার স্থলে পূর্ব বাংলার গভর্নরের শাসন জারি করা হয়। ফলে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অধিকাংশই বাস্তবায়ন ঘটতে পারেনি। তবে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেবার পর থেকে যুক্তফ্রন্টের মধ্যেও ভাঙনের সূত্রপাত ঘটে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে বেরিয়ে যায়। এভাবে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন করার পরও দুর্ভাগ্যজনকভাবে যুক্তফ্রন্টের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**১৯৫৪ সালের নির্বাচনের তাৎপর্য সম্পর্কে তুলে ধরুণ।**

সারসংক্ষেপ :

পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন ও যুক্তফ্রন্ট গঠন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী সমমনা দলগুলোর সমন্বয়ে যুক্তফ্রন্ট নামে একটি রাজনৈতিক জোট গড়ে ওঠে এবং তারা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এই নির্বাচনকে বলা হয় মুসলিম লীগ তথা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে 'ব্যালট বিপ্লব'। পাকিস্তানিদের নানাধরণের ষড়যন্ত্র ও অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ডের ফলে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করেও ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি। এই নির্বাচনের মধ্যদিয়ে বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলিমলীগকে ব্যালটের মাধ্যমে প্রত্যাখ্যান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন কত সালে অনুষ্ঠিত হয়?

ক. ১৯৫২ খ. ১৯৫৪ গ. ১৯৫৬ ঘ. ১৯৫৮

২। যুক্তফ্রন্ট নামক রাজনৈতিক জোটে মোট কতটি দল ছিল?

ক. ১৬টি খ.০৬টি গ. ২৬টি ঘ. ১৭টি

৩। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ইস্তেহারে কতটি দফা ছিল?

ক. ২১ টি খ. ৪১ টি গ. ১৯ টি ঘ. ৬টি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

ক সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত একটি দেশ। সেখানকার সিংহভাগ মানুষ শাসকশ্রেণীর থেকে স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত এবং তারা নানামত ও পথ ভুলে গিয়ে একই জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে একটি রজনৈতিক মোর্চা গঠন করেন। নব গঠিত এই রাজনৈতিক মোর্চাটি শাসক দলের বিরুদ্ধে নির্বাচনে জয় লাভ করে। এই নির্বাচনে জয়লাভ তাদের জাতীয়তাবাদী চেতনা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ক. যুক্তফ্রন্ট কী? ১

খ. যুক্তফ্রন্টে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা কতটি এবং কীকী?। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নির্বাচনের কর্মসূচিসহ ফলাফল লিখুন। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখুন। ৪

পাঠ-৯.৩ পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন

	মূখ্য শব্দ	পূর্ব বাংলা, বৈষম্য, অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি

সুলতানি ও নবাবি আমল থেকেই বাংলার একটি বিশেষ ঐতিহ্য ছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বাঙলায় আগত বিদেশী পর্যটকরা বাংলাকে 'সম্পদে পরিপূর্ণ নরক' বলে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ এক সময় বাংলা প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত থাকলেও এখানকার প্রত্যেকটি জনপদ ছিল সম্পদে পরিপূর্ণ। ব্রিটিশ শাসনামলে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ নামে নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। যার রাজধানী করা হয় ঢাকাকে। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব অনুসারে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হলেও পূর্ব বাংলা কখনোই লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক পৃথক রাষ্ট্রের মর্যাদা পায়নি। ফলে পূর্ব বাংলাকে প্রায় সুদীর্ঘ ২৪ বছর ধরে আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের জন্য আন্দোলন ও সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই দু'দশকেরও অধিক সময় ধরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষকে তাদের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। কেবল তাই নয়, তাদের প্রতি নানাধরণের বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতি অনুসরণ করছে। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর এই বৈষম্য ও নিপীড়নমূলক নীতির বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলায় প্রথমে প্রতিবাদী আন্দোলন শুরু হয়। আর এই প্রতিবাদী আন্দোলন থেকেই শুরু হয় স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আন্দোলন যার সফল পরিণতি একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ।

পূর্ব বাংলা ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের বৈষম্যমূলক নীতিগ্রহণ করেছিল। অনেকেই পূর্ব বাংলার জনগনের প্রতি পাকিস্তানের এই আচরণকে 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ' বলে অভিহিত করেছেন। অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদে নিম্নোক্ত কতগুলো বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয।

১. অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদে বিদেশী শক্তি জোরপূর্বক একটি ভূখন্ড বা সম্প্রদায়কে নানাদিক থেকে শোষণ ও নির্যাতনের নীতি গ্রহণ করে।
২. অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদে প্রভূত্বকারী শক্তি জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল করে।
৩. তারা ক্ষমতা ব্যবহারের হাতিয়ার হিসেবে প্রথম রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল করে।
৪. উপনিবেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বদলে তাদের কাঁচামাল, সম্পদ পাচার করে নিজ দেশের বা অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটায়।
৫. উপনিবেশিক শক্তি দেশীয় মূল্যবোধ, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিসহ স্বকীয়তা ধ্বংস করে নিজেদের শিক্ষা, ভাষা, সংস্কৃতি চাপিয়ে দেয়।

পাকিস্তান সৃষ্টির কয়েক মাসের মধ্যে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসনের বদলে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ বাঙালির উপর চেপে বসে। একমাত্র ইসলাম ধর্ম ছাড়া পাকিস্তান ও পূর্ব বাংলার মধ্যে আর কোন বিষয়ে মিল ছিল না। প্রায় দেড় হাজার মাইলের ব্যবধান ছাড়াও নৃতাত্ত্বিক, ভূ-রাজনৈতিক, ভাষা ও সংস্কৃতি, সমাজ ও অর্থনীতিসহ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রচুর বৈসাদৃশ্য ছিল। এ সকল বৈসাদৃশ্যের কারণে একাত্তরে অনিবার্য হয়ে দেখা দেয় মহান মুক্তিযুদ্ধ। পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো নিম্নরুপ-

রাজনৈতিক বৈষম্য

১. পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাব অনুসারে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল নিয়ে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের কথা থাকলেও ১৯৪৭ সালে উল্লিখিত অঞ্চলসমূহ নিয়ে পাকিস্তান নামক একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়।

২. পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র পূর্ব বাংলার স্বায়ত্বশাসন ও বাঙালির স্বার্থের প্রতি চরম অবহেলা করতে থাকে। পূর্ব বাংলার ৫৬% লোকের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জনসংখ্যা অনুসারে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থেকে বাঙালিদের বঞ্চিত করা হয়।

৩. সংবিধান নাগরিকের রাজনৈতিক অধিকার। কিন্তু ১৯৪৭ সালে নতুন রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা নিজ নিজ রাষ্ট্রে সংবিধান প্রণয়নের কথা থাকলেও পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণীত হয় ১৯৫৬ সালে। প্রায় নয় বছর সময় লেগেছিল একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে। এই সংবিধানের মাধ্যমে পূর্ব বাংলাকে 'পূর্ব পাকিস্তান' নামকরণ করা হয়। এই সংবিধানে সমস্ত ক্ষমতা পশ্চিম পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানদের পশ্চিম পাকিস্তানিদের উপর নির্ভরশীল রাখা হয়।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অবহেলা করতে থাকে। ১৯৫৪ সালে নির্বাচিত হয়েও তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারেনি।

৫. বাঙালি নেতৃবৃন্দের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র দারুণ অবহেলা ও নির্যাতন করতে থাকে। পাকিস্তান আমলে সিংহভাগ বাঙালি নেতা জেলখানায় বন্দিজীবন কাটিয়েছেন। মৌলিক গণতন্ত্রের নামে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

প্রশাসনিক বৈষম্য

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বাঙালিদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবিসহ অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি 'এলিট শ্রেণি' গড়ে তোলা হয়। মন্ত্রীদের পরই ক্ষমতাধর ছিলেন এই এলিট শ্রেণী। ১৯৬৫-৭০ সাল পর্যন্ত এক জরিপে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৬৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৪৫ জনই পাঞ্জাবি, বাঙালি ছিলেন মাত্র তিনজন। অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রনালয়সহ বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ে বাঙালি অফিসারদের নিয়োগ করা হত না। এভাবেই পূর্ব বাংলার জনগণের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হত।

প্রতিরক্ষা বৈষম্য

পাকিস্তান প্রতিরক্ষা বাহিনীতেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্য ছিল চোখে পড়ার মতো। পাকিস্তান আমলের বেশির ভাগ সময়জুড়ে ক্ষমতায় ছিল সামরিক বাহিনী। বাঙালিদের সামরিক বাহিনী থেকে দূরে সরিয়ে রাখার নীতি বাঙালি জাতি ও সামরিক বাহিনীতে কর্মরত সামরিক সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করে। সে কারণে মুক্তিযুদ্ধের সময় পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালি সদস্যরা পাকিস্তানি আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রতিরোধযুদ্ধে জনগণের সাথে অংশগ্রহণ করে। নিম্নে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বৈষম্যগুলো তুলে ধরা হল-

১. ১৯৫৫ সালের এক হিসাব থেকে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার মোট সংখ্যা ছিল ২২১১ জন। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ছিল ৮২ জন যা শতকরা হিসাবে ৩.৭% মাত্র।

২. পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে পাঞ্জাবি আধিপত্য নিশ্চিত করার জন্যে প্রাদেশিক কোটা নির্ধারণ করা হয়। এতে ৬০% পাঞ্জাবি, ৩৫% পাঠান এবং অবশিষ্ট ৫% পশ্চিম পাকিস্তানের বাকি এলাকা এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে নিয়োগ করার বিধান চালু করা হয়।

৩. পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নিয়োগ বৈষম্য দেখলে যে কেউই আঁতকে উঠবেন। সেনা, নৌ, ও বিমান বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে বৈষম্যনীতি পরিলক্ষিত হয়। সেনাবাহিনীর ক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি। অফিসার পদে বাঙালিদের উপস্থিতি ছিল না বললেই চলে। কেবল অফিসার নয় সাধারণ সৈনিক নিয়োগের ক্ষেত্রেও বাঙালি সৈনিকদের সুযোগ ছিল সীমিত। তৎকালীন সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ৫,০০,০০০ সদস্যের মধ্যে বাঙালি ছিলেন ২০,০০০ জন মাত্র যা মোট সংখ্যার ৪% মাত্র।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তান ভয়াবহ অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়। সে কারণে পূর্ব পাকিস্তান কখনোই অর্থনৈতিকভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সমুদয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হত বলে পূর্ব পাকিস্তানের সকল আয় চলে যেত পশ্চিম পাকিস্তানে। স্টেট ব্যাংকসহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ পাচার হতো সহজেই। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক এরূপ শোষণমূলক নীতি অনুসরণের ফলে ১৯৬০ এর দশকে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বৈষম্য

শিক্ষা ক্ষেত্রেও বাঙালিরা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল। পাকিস্তানি শাসকচক্র বাঙালিদের অশিক্ষিত রেখে তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করতে চেয়েছিল। তাদের ভয় ছিল বাঙালিরা শিক্ষিত হলে চাকরিসহ প্রশাসনের সর্বক্ষেত্রে এবং দেশ শাসনে অংশীদারিত্ব দাবী করবে। এজন্য পূর্ব পাকিস্তানের নিরক্ষরতা দূরীকরণের লক্ষে তেমন কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। তাছাড়া শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের এক-তৃতীয়াংশ পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় করা হয়েছে। শিক্ষাখাতে বরাদ্দের ক্ষেত্রে এরূপ বৈষম্যমূলক নীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষা প্রসারের গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ২০% আর পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হয়েছে ৮০%। একইভাবে পাকিস্তানের ১৬টি গবেষণা কেন্দ্রের মধ্যে ১৩টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে আর মাত্র তিনটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানে। আর মেধাবৃত্তির ক্ষেত্রে মোট ৩৫ টি বৃত্তির মধ্যে ৩০টি পশ্চিম পাকিস্তানের জন্যে আর ৫টি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে।

সামাজিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যও প্রকট আকার ধারণ করেছিল। কৌশলে পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দামের পার্থক্যও কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হত। যখন পশ্চিম পাকিস্তানে চালের মন ১৮ টাকা তখন পূর্ব পাকিস্তানে চালের মন ছিল ৫০ টাকা।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

সাংস্কৃতিক বৈষম্য ছিল পাকিস্তান ভাঙ্গার প্রধান কারণ। দু'অঞ্চলের ভাষা সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৬ শতাংশ এবং তাদের ভাষা বাংলা। অপরদিকে পাকিস্তানের বাকি ৪৪ শতাংশ লোকের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ছিল বিভিন্ন ধরণের। এই ৪৪ শতাংশ লোকের মধ্যে মাত্র ৭.২ শতাংশ লোকের ভাষা ছিল উর্দু। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি পর থেকে শাসকগোষ্ঠী ৭.২ শতাংশ লোকের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার চক্রান্তে লিপ্ত হলে বাঙালিরা তা প্রতিহত করতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ডাক দেয়। শুরু হয় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। এই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলোনের অনুপ্রেরণায় এক সময় স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন শুরু হয় এবং বাঙালিরা বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন ভূখন্ড লাভ করে।

রবীন্দ্র সাহিত্যসহ বিভিন্ন অসাম্প্রদায়িক সাহিত্য বাঙালির প্রাণ। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এ সকল সাহিত্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ফলে বাঙালির মনে এক ধরণের ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কেবল তাই নয় বাঙালির প্রাণের উৎসব বাংলা বর্ষবরণকেও পাকিস্তানিরা বন্ধ করে দেয়। ১৯৬৭ সালে ১লা বৈশাখ পালনকে আইয়ুব খান হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব বলে আখ্যা দেন। আইয়ুব খানের এরূপ ঘোষণা ছিল বাঙালি জাতির হাজার বছরের সংস্কৃতির মূলে কুঠারাঘাত। এমনিভাবে পাকিস্তানের দুটি অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক বৈষম্য প্রকট আকার ধারণ করে। পূর্ব বাংলার প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের নানাধরণের বৈষম্যমূলক নীতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি শাসকচক্রের বিরুদ্ধে, ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন, ছয় দফাভিত্তিক আন্দোলন, আগরতলা মামলা বিরোধী আন্দোলন , ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের নির্বাচন এবং সর্বশেষে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মতো গণতান্ত্রিক আন্দোলন সংগ্রাম সংগঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সকল আন্দোলনে বাঙালিরা সফলতা লাভ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**পূর্ব বাংলার প্রতি পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতিগুলো তুলে ধরুণ।**

সারসংক্ষেপ :

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় পূর্ব বাংলা কেবল দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়েছিল। তবে একমাত্র ধর্মীয় মিল ছাড়া পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আর কোন মিল ছিল না। ধর্মের ভিত্তিতে একক রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও, শুরু থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার সাথে ঔপনিবেশিক আচরণ শুরু করে। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাঙালিদের উপর নানাধরণের অত্যাচার, নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু হয়, যার প্রতিবাদে বাঙালিরা তীব্র প্রতিক্রীয়া ব্যক্ত করে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেন। শুরু হয় স্বায়ত্বশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাকিস্তানের সংবিধান প্রণীত হয় কত সালে?
ক. ১৯৫৬ খ. ১৯৪৭ গ. ১৯৪৬ ঘ. ১৯৪০

২। পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার কত শতাংশ বাঙালি?
ক. ৫৫% খ. ৫৬% গ. ৭.২% ঘ. ৪৪%

৩। ‘মৌলিক গণতন্ত্র’ কে চালু করেন?
ক. আইয়ুব খান খ. জেনারেল ইয়াহিয়া খান গ. জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘ. রাও ফরমান আলী

৪। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যার কত শতাংশ বাঙালি?
ক. ৪% খ. ৫% গ. ২০% ঘ. ১৫%

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

‘ক’ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। দেশটির শাসকশ্রেণী ‘উ’ ভাষী কিন্তু দেশের সিংহভাগ মানুষ ‘ব’ ভাষী যারা দেশটির পূর্বাংশে বসবাস করে। শাসকশ্রেণী তাদের নিজস্ব ভাষা ‘উ’ কে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কেবল ভাষার ক্ষেত্রেই বৈষম্য নয়, তারা দেশটির পূর্বাংশের মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক এবং চাকুরির অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। ‘ক’ এর পূর্বাংশের মানুষের প্রতি শাসকশ্রেণী নানাধরণের বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করে এবং তাদের প্রতি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশিক আচরণ শুরু করে।

ক. পূর্ব পাকিস্তান নামকরণ হয় কত সালে? ১
খ. পূর্ব বাংলা সম্পর্কে ধারণা দিন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পূর্ব বাংলার প্রতি বৈষম্যমূলক নীতিগুলো সম্পর্কে বিবরণ দিন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে অভ্যন্তরীণ উপনিবেশবাদ সম্পর্কে ধারণা দিন এবং এর বৈশিষ্টসমূহ লিখুন । ৪

পাঠ-৯.৪ ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচির গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ	**মুক্তির মহাসনদ ছয় দফা, শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বায়ত্বশাসন**

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা বাঙালি জাতির রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পূর্ব বাংলার মানুষের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে ছয় দফা আন্দোলনের ভূমিকা অপরিসীম। একথা মানতেই হবে যে, এই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী না হলেও এর প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী। এটি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং মুক্তির মহাসনদ।

আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

ছয় দফা আন্দোলন আকস্মিকভাবে গড়ে ওঠা কোন আন্দোলন নয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর থেকে পুর্ব বাংলার মানুষের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্র অন্যায়ভাবে যে সীমাহীন অত্যাচার, নিপীড়ন ও বৈষম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছিল তার প্রেক্ষিতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। নিম্নে ছয় দফা আন্দোলনের পটভূমি তুলে ধরা হল-

রাজনৈতিক পটভূমি

ছয় দফা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রচিত হয় মূলত ১৯৪৭ সালেই, যখন লাহোর প্রস্তাব এর ভিত্তিতে দেশ বিভাজন করা হয়। কেননা দেশ বিভাজিত হলেও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, প্রত্যেকটি প্রদেশকে স্বায়ত্বশাসন দেওয়া হবে। কিন্তু দেশ বিভাগের পর আঠারো বছর অতিক্রান্ত হলেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা এ বিষয়ে আশাব্যঞ্জক কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। বরং তারা নিষ্পেষণের হাত সদা প্রসারিত রেখে ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। যেমন ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়ে পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠিত হয়। কিন্তু মাত্র ৫৬ দিনের ব্যবধানে তারা ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৯২(ক) ধারা অনুযায়ী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাকে বাতিল ঘোষণা করে। এছাড়াও দীর্ঘ প্রতিক্ষিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংবিধান ১৯৫৬ সালে কার্যকর হলেও মাত্র দুই বছরের মাথায় ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান সামরিক শাসন জারি করে তা আবার বাতিল করে দেন এবং ১৯৫৯ সালে অগণতান্ত্রিক 'মৌলিক গণতন্ত্র' চালু করে জনগণকে তাদের ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন। উল্লিখিত অবস্থার প্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি উত্থাপনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য স্বায়ত্বশাসন দাবি করে।

সামাজিক প্রেক্ষাপট

দুই পাকিস্তানের ব্যবধান শুধু ভৌগোলিক ক্ষেত্রেই নয় বরং দৈনন্দিন জীবনাচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যাভাসেও রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। পূর্ব পাকিস্তানের তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তান ছিল জীবনযাত্রার মানে অনেক এগিয়ে। কিন্তু শাসকগোষ্ঠী এই সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণে কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়নি যা ছয় দফা দাবির জন্য মঞ্চ তৈরি করে।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

ছয় দফা ঘোষণার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য ভূমিকা পালন করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হাতে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক শোষণের অনেক উদাহরণ রয়েছে। যেমন-১৯৬২ সালের সংবিধানে বৈষম্য দূর করার কথা বলা হলেও বাস্তব প্রয়োগের অভাবে তা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকারের মোট রাজস্বের ৬০ ভাগ অর্জিত হতো পূর্ব পাকিস্তান থেকে। অথচ উন্নয়ন বাজেটে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ থাকতো মোট বাজেটের মাত্র ২৫ ভাগ। এই বিশাল বৈষম্য ছয় দফা দাবি ঘোষণার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট রচনা করে ছিল।

সামরিক প্রেক্ষাপট

সামরিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান নিজেদেরকে খুবই অনিরাপদবোধ করে ১৯৬৫ সালে সংঘঠিত পাক-ভারত যুদ্ধের সময়। কারণ যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত এলাকায় যতটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় তার ১০ ভাগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি পূর্ব পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত এলাকায়। ভারত চাইলে যে কোন সময় পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে পারতো। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আলাদা সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে অনুভূত হয়।

প্রশাসনিক পটভূমি

রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মতো প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও বাঙালিদের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস ও সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবিসহ অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি ‘এলিট শ্রেণী’ গড়ে তোলা হয়। এক্ষেত্রে বাঙালিরা ছিল বঞ্চিত। ১৯৬৫-৭০ সাল পর্যন্ত এক জরিপে দেখা যায় যে, পাকিস্তানের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ৬৯ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৪৫ জনই পাঞ্জাবি, বাঙালি ছিলেন মাত্র তিনজন। এ ধরনের বাস্তব অবস্থাও ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচির ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিল।

ঐতিহাসিক ছয় দফা ঘোষণা

পাক-ভারত যুদ্ধ সমাপ্ত হলে ১৯৬৬ সালের ৫-৬ ফেব্রুয়ারি লাহোরে নিখিল পাকিস্তান জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীকার আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মোট ২১ সদস্যের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক দাবি সম্বলিত ‘ছয় দফা কর্মসূচি’ সম্মেলনে পেশ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে অনুষ্ঠান স্থলের বাইরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন। যা ঐতিহাসিক ছয় দফা নামে পরিচিত। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এতে পূর্ণ সমর্থন প্রকাশ করে এবং জনমত তৈরির জন্য ঢাকাসহ সারাদেশে প্রচারপত্র ছড়িয়ে দেয়। ‘বাঙালির দাবি ছয় দফা, বাঁচার দাবি ছয় দফা’ প্রভৃতি স্লোগানে মুখরিত হয় পূর্ব পাকিস্তান। ১৯৬৬ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে তৎকালীন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি ‘আমাদের বাঁচার দাবি ছয় দফা’ নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে এবং ১৯ মার্চে কাউন্সিল অধিবেশনে ‘ছয় দফা কর্মসূচি’ অনুমোদন লাভ করে।

ঐতিহাসিক ছয় দফার ধারাসমূহ

প্রথম দফাঃ পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও শাসনতন্ত্র

লাহোর প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র তৈরি করে সত্যিকারের একটি যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকার হবে সংসদীয় পদ্ধতির। সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার থাকবে। আর প্রদেশগুলো পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্বশাসন লাভ করবে।

দ্বিতীয় দফাঃ কেন্দ্রিয় সরকারের ক্ষমতা

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ক ক্ষমতা থাকবে কেন্দ্রিয় সরকারের হাতে। আর বাদ বাকী ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে।

তৃতীয় দফাঃ মুদ্রা ও অর্থবিষয়ক

এ বিষয়ক বিকল্পসহ দুটি প্রস্তাব করা হয়। যথাঃ-

ক) সহজ ও অবাধ বিনিময়যোগ্য দুটি পৃথক মুদ্রা পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্রচলন করতে হবে। এজন্য দুই প্রদেশে দুইটি পৃথক স্টেট ব্যাংক থাকবে এবং মুদ্রা ও ব্যাংক পরিচালনার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। অথবা,

খ) একটি কেন্দ্রিয় ফেডারেল ব্যাংকের অধীনে দুই প্রদেশে দুটি রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং দুই প্রদেশের জন্য অভিন্ন মুদ্রা প্রচলন করতে হবে। তবে এ ক্ষেত্রে সংবিধানে এমন বিধান থাকতে হবে যাতে এক প্রদেশের মুদ্রা অন্য প্রদেশে পাচার না হয়।

চতুর্থ দফাঃ রাজস্ব ও শুল্কনীতি বিষয়ক

প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকবে সকল প্রকার কর ধার্য ও কর আদায়ের ক্ষমতা। তবে প্রদেশে আদায়কৃত রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অংশ কেন্দ্রে প্রেরণ করতে হবে যা রিজার্ভ ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে। এভাবে ফেডারেল সরকারের তহবিল সমৃদ্ধ হবে।

পঞ্চম দফাঃ বৈদেশিক মুদ্রা ও বাণিজ্য

বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ ও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনা করার ক্ষমতা থাকবে প্রাদেশিক সরকারের হাতে। দুই প্রদেশের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার আলাদা হিসাব থাকবে। প্রয়োজনে দুই প্রদেশ থেকে সমান হারে অথবা সংবিধানে উল্লেখিত নির্ধারিত হারে কেন্দ্রের ফেডারেল সরকারকে বৈদেশিক মুদ্রা প্রদান করতে হবে। এছাড়াও বিনা শুল্কে উভয় প্রদেশের আমদানী ও রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হবে এবং বিদেশের সাথে এ সংক্রান্ত সকল প্রকার চুক্তি সম্পাদন, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপন এবং আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের নিকট সাংবিধানিকভাবে অর্পণ করতে হবে।

ষষ্ঠ দফাঃ প্রতিরক্ষা বিষয়ক

প্রদেশের নিজস্ব নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি নামে প্রাদেশিক সেনাবাহিনী গঠন ও পরিচালনা করার ক্ষমতা সাংবিধানিকভাবে প্রদেশকে দিতে হবে।

ছয় দফার প্রতিক্রিয়া

ঐতিহাসিক ছয় দফার ধারাগুলো ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক এবং শোষণ ও নির্যাতন থেকে মুক্তির মহাসনদ। তাই পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ এটির প্রতি স্বত:স্ফূর্ত সমর্থন জানায়। ছয় দফা ঘোষণা করায় শেখ মুজিবুর রহমান দারুণভাবে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার মূর্তপ্রতীকে পরিণত হন। আবার অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের ব্যাপক প্রচার ও প্রচারণার কারণে ছয় দফা আন্দোলন ক্রমশ ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর রূপ ধারণ করতে থাকে। অন্যদিকে তৎকালীন সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ছয় দফার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। তারা এটিকে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের বিরোধী এবং 'রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা' বলে প্রচার করতে থাকে। তারা ছয় দফাকে নানাভাবে অপব্যাখ্যা করে জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা অব্যাহত রাখে। পশ্চিম পাকিস্তানে এটি তেমন একটা আলোড়ন ফেলতে না পারলেও পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয় । একারণে পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার দমননীতি আরম্ভ করে। পূর্ববঙ্গের তৎকালীন গভর্ণর মোনায়েম খানের নির্দেশে শেখ মুজিবর রহমানসহ বহু নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ১৯৬৬ সালের ৭ জুন সকল বন্দীদের নি:শর্ত মুক্তির দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক হরতালের ডাক দেওয়া হয়। ঐ দিন সরকার ঘোষিত নিষেধাজ্ঞা না মেনে জনগণ স্বেচ্ছায় মিছিল বের করে। অবৈধভাবে মিছিল করায় পুলিশ জনসাধারণকে ছত্রভঙ্গ করতে গুলিবর্ষণ করে। ফলে কিশোর মনুমিয়াসহ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে সর্বমোট ১১ জন নিহত ও শতাধিক লোক আহত হয়। ১৯৬৭ সালে আন্দোলন আরো জোরদার হয় আইয়ুব খান বিরোধী সকল রাজনৈতিক দল একত্রিত হবার মধ্যদিয়ে। এভাবে 'ছয় দফা আন্দোলন' পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের জনগণের নিকট ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

'ছয় দফা আন্দোলনের' গুরুত্ব ও তাৎপর্য

১। ছয় দফাকে শেখ মুজিবুর রহমান নিজেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মুক্তির মহাসনদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন এবং এটিকে নিজেদের অধিকার আদায়ের মাধ্যম হিসেবে অভিহিত করেছিলেন।

২। ছয় দফা কর্মসূচি ছিলো পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়ণের বিরুদ্ধে সুসংবদ্ধ ও শক্তিশালী পদক্ষেপ। এর মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।

৩। ছয় দফার প্রথম দফাতেই বলা হয়েছে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের কথা। অর্থাৎ প্রত্যেকটি প্রদেশকে তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে হবে। কেননা ঔপনিবেশিক শাসনামলের মতো তারা পূর্ব পাকিস্তানকে একটি অর্থ ও ধনসম্পদ উৎপাদনের কারখানা হিসেবে গণ্য করতো। তারা উৎপাদিত ফসল, আদায়কৃত রাজস্ব, উপার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা প্রভৃতি এই অঞ্চল থেকে নিয়ে যেত কিন্তু সরকারিভাবে এই অঞ্চলের অবকাঠামো, শিক্ষাসহ নানাক্ষেত্রে তারা চরম অনিহার বহি:প্রকাশ ঘটিয়েছে। তাই প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের অধিকার ছিল এদেশের আপামর জনতার দীর্ঘ দিনের দাবি।

৪। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী জানতো যে, ছয় দফা শুধুই স্বায়ত্বশাসনের দাবি নয়। ছয় দফা বাস্তবায়িত হলে তাদের আয়ের বড়ো উৎস হাত ছাড়া হয়ে যাবে। ফলে তারা ছয় দফাকে জাতীয় ঐক্যের বিরোধী বলে চিহ্নিত করে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে আখ্যা দেয়। কিন্তু বাঙালি জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর হীন ষড়যন্ত্র বুঝতে পারে এবং তারা বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় যার সূত্রপাত হয়েছিল ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। বাঙালিরা বুঝতে পারে যে, দাবি আদায়ের একমাত্র মাধ্যম হলো আন্দোলন । তাই তারা ছয় দফা আন্দোলনকে ব্যাপক সমর্থন দান করে।

৫। ছয় দফা আন্দোলনে উজ্জীবিত জনগণ '৬৯ এর গণঅভ্যূত্থানে ব্যাপকভাবে অনুপ্রাণিত হয়। এই গণঅভ্যূত্থানের ফলাফল ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদ নির্বাচনকে প্রভাবিত করে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় আওয়ামী

লীগ বিপুল ভোটে বিজয় অর্জন করে। কারণ জনগণ বুঝতে পেরেছিল যে, সমসাময়িক রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে একমাত্র আওয়ামী লীগ জনগণের জন্য রাজনীতি করে। তারা সর্বদা জনগণের ভালো মন্দ দেখভাল করে। এই আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ পরিচালিত ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলন।

৬। ছয় দফা আন্দোলন জনগণকে জাতীয় চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথ দেখায়। যা গণঅভ্যুত্থানে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ করে এমনকি পর্যায়ক্রমে তা মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে সাহস, অনুপ্রেরণা ও উদ্দীপনা জোগায়। এভাবে এমন এক গণজোয়ারের সৃষ্টি হয় যা মোকাবেলা করা পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাড়ায়। অভ্যুদয় হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

শিক্ষার্থীর কাজ	ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

ঐতিহাসিক ছয় দফা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ছয় দফা দাবি ছিল পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় সরকার কর্তৃক দীর্ঘকাল ধরে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা হওয়ার সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং জনগণ ব্যাপকভাবে এটিকে সমর্থন জানায়। তারা ঐতিহাসিক ছয় দফাকে মুক্তির মহাসনদ বলে আখ্যায়িত করে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এটিকে রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা বলে অপপ্রচার চালায়। মূলত, ঐতিহাসিক ছয় দফাই বাঙালি জাতিকে মুক্তির অনুপ্রেরণা দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন
সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি কে ঘোষণা করেন?
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. এ কে ফজলুল হক গ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ. মাওলানা ভাসানী

২। ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচি ঘোষণা করা হয় কত সালে?
ক. ১৯৬৬ খ. ১৯৬৫ গ. ১৯৫৮ ঘ. ১৯৫৬

৩। ঐতিহাসিক ছয়দফায় কয়টি মুদ্রার কথা হয়েছে?
ক. ১টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. কোনটিই নয়

৪। পাকিস্তান সরকার ছয় দফাকে কি বলে আখ্যায়িত করে-
ক. মুক্তির সনদ খ. রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতা গ. পাকিস্তান ভাঙ্গার দলিল ঘ. খ ও গ উভয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

'প' দক্ষিণ এশিয়ার একটি মুসলিম দেশ যেটি দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটির পূর্বাংশের জাতীয়তাবাদী নেতা জনাব এম রহমান। 'প' এর শাসকগোষ্ঠী পূর্বাংশের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘদিন ধরে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে। এই প্রেক্ষিতে জনাব এম রহমান বাঙালির স্বাধিকার ও স্বায়ত্বশাসনের জন্যে ৬টি দাবি সম্বলিত একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। 'প' এর বাঙালি জনগোষ্ঠী এটাকে তাদের প্রাণের দাবি বলে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে 'প' এর শাসকগোষ্ঠী এটাকে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে আখ্যায়িত করেন।

ক. ঐতিহাসিক ছয়দফা কী ? ১
খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেন ছয় দফা ঘোষণা করলেন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঐতিহাসিক ছয়দফা কর্মসূচির দফাগুলো লিখুন। ৩
ঘ উদ্দীপকের আলোকে ছয় দফা কর্মসূচির গুরুত্ব এবং এর প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৯.৫ ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার পটভূমি ও মামলার সারকথা জানতে পারবেন এবং
- এই মামলার পরিণতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**ছয় দফা, আগরতলা মামলা, শেখ মুজিবুর রহমান, স্বায়ত্বশাসন ও বিশেষ ট্রাইব্যুনাল**

স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের প্রায় এগারো (১৯৫৮-৬৯) বছরের শাসনামলের সবচেয়ে ঘৃণ্য ও প্রহসনমূলক ঘটনা হলো আগরতলা মামলা। ১৯৬৬ সালের পর থেকে ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে পূর্ব পাকিস্তানে যখন গণআন্দোলন জোরদার হতে থাকে তখন স্বৈরাশাসক আইয়ুব খান ঐ আন্দোলনকে দমিয়ে রাখতে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল ও নেতৃত্বশূন্য করতে এরকম প্রহসনমূলক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেন। কাগজে কলমে এই মামলাটির নাম ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য । তবে গণ অন্দোলনের মুখে আইয়ুব সরকার শেষ পর্যন্ত মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হন।

আগরতলা মামলার প্রেক্ষাপট:

দেশ বিভাগের পর থেকে পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ নানাভাবে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছিল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের জনগণ আরো বুঝতে পারে যে, কঠোর আন্দোলন না হলে তাদের দাবি আদায় হবে না। ১৯৬৭ সালের জুন মাসে রেডিও, টেলিভিশনে রবীন্দ্র সঙ্গীত প্রচার বন্ধ এবং হিন্দু সংস্কৃতি আখ্যা দিয়ে পহেলা বৈশাখ পালনে বিধি নিষেধ আরোপ করা ও বাংলা ভাষার সংস্কার করে আরবি হরফে লেখার সরকারি উদ্যোগের প্রতিবাদে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান প্রতিবাদ মূখর হয়ে ওঠে। ফলাফল স্বরূপ ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন অনেকটাই গণআন্দোলনে রূপধারণ করে এবং গণমানুষের যুক্তির প্রতীক হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুরের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তবে সরকারও বসে থাকবে কেন? তারা নানা কৌশলে আন্দোলন দমন করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি সরকার একটি রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের করে। এতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করা হয় এবং সর্বমোট ৩৫ জন সামরিক ও বেসমারিক ব্যক্তিকে আসামি করা হয়।

মামলার সারকথা:

১৯৬৮ সালের ৬ জানুয়ারি ২ জন সিএসপি অফিসারসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এই যে, তারা পূর্বের বছর অথাৎ ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের আগরতলায় এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এবং ভারতীয়দের সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটানোর পরিকল্পনা করেন। এমনকি ঐ অভ্যুত্থান সফল করতে ভারতীয়দের নিকট থেকে অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহ করেছে বলে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এই মর্মে তারা অর্থ ও অস্ত্রের একটি তালিকাও করেছিল। কয়েকদিন পর এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, গ্রেফতারকৃত আসামীরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং এ ব্যাপারে আরো গভীর অনুসন্ধান চলছে। ৬ জানুয়ারি আসামীদের গ্রেফতারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ায় ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি "ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা পরিচালনার" আভিযোগ এনে শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধান আসামী করে পূর্বের ২৮ জনসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আরেকটি নতুন মামলা দায়ের করা হয়। কথিত আগরতলার ষড়যন্ত্রকে কেন্দ্র করে এই মামলা হওয়ায় এটিকে "আগরতলা মামলা" নামে পরিচিতি লাভ করে। প্রকৃতপক্ষে এটি বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে রাজনীতি ও আন্দোলন সংগ্রাম থেকে দূরে রাখার একটি সরকারি কূটকৌশল।

আগরতলা মামলার উদ্দেশ্য

১. পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নির্মূল করা
২. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে এই মনোভাব জাগিয়ে তোলা যে বাঙালিরা কখনো বিশ্বাসযোগ্য নয়।
৩. শেখ মুজিবকে রাজনীতি থেকে অপসারণ করা
৪. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করে বিভেদ ও ব্যবধান আরো বাড়িয়ে দেয়া।

আগরতলা মামলার অন্যতম আসামিগণ হলেন–

১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি মামলার আসামীদের তালিকা নিম্নরূপ

১. শেখ মুজিবুর রহমান (ফরিদপুর)
২. লে.কমাণ্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন (বরিশাল)
৩. সার্জেন্ট জহুরুল হক (নোয়াখালী)
৪. ক্যাপ্টেন শওকত আলী (ফরিদপুর)
৫. ক্যাপ্টেন নূরুজ্জামান (নরসিংদী)

বিচার প্রক্রিয়া

মামলা পরিচালনা করার জন্য সরকার ১৯৬৮ সালের ১২ এপ্রিল আইন ও বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত একটি ফৌজদারী অধ্যাদেশ জারি করে। অধ্যাদেশ নং ৫-১৯৬৮ অনুয়ায়ী বিচারকার্য সুচারুরূপে সম্পূর্ণ করার জন্য সাবেক প্রধান বিচারপতি এস এ রহমানকে চেয়ারম্যান এবং বিচারপতি এম আর খান ও বিচারপতি মকসুমুল হাকিম এর সমন্বয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাইবুনাল গঠন করা । এই মামলায় রাষ্ট্রপক্ষের প্রধান কৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বিখ্যাত আইনজীবী মঞ্জুর কাদের।

অপরদিকে আসামিপক্ষে মামলা পরিচালনার জন্য একটি 'ডিফেন্স কমিটি' গঠন করা হয়। এই কমিটিতে ছিলেন ড. আলীম আল রাজী, মওদুদ আহমেদ, আতাউর রহমান খান, আবদুস সালাম খান, খান বাহাদুর ইসলাম, খান বাহাদুর নাজিরুদ্দিন, জহিরুদ্দিন, জুলমত আলী খান ও মোল্লা জালাল উদ্দিন প্রমূখ এবং নেতৃত্ব দেন ইংল্যান্ডের রাণীর আইন বিষয়ক উপদেষ্টা বিখ্যাত ব্রিটিশ আইনজীবী টমাস উইলিয়াম। মামলার অভিযোগ সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকলেই লিখিত ও মৌখিকভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে উচ্চ কণ্ঠে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া ধামাচাপা দেওয়ার জন্য অর্থাৎ জনগণের এবং সারা বিশ্বের দৃষ্টি অন্য দিকে ঘোরাতে এই মামলা নাটকের উদ্ভব ঘটানো হয়েছিল। মামলায় প্রায় আড়াই শতাধিক ব্যক্তির নিকট থেকে সাজানো সাক্ষ্য নেওয়া হয়। সরকারের কঠোর নীতি গ্রহণের জন্য অনেকেই সাক্ষী হতে বাধ্য হলেও তারা আদালতে এসে বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য আসামিদের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে বিচারকার্যে সরকারের আশানুরূপ অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

মামলার প্রতিক্রিয়া ও প্রত্যাহার:

মামলা দায়েরের খবর ছড়িয়ে পড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা মামলার আসামি বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্যদের মুক্তির দাবিতে জনমত তৈরিতে কাজ করতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বুঝতে পারে যে, শেখ মুজিব হচ্ছেন তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা তথা দাবি দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে অগ্রসেনানী। তাকে যদি কোনভাবে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় তাহলে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য মঙ্গলের কারণ হবে। ফলে শেখ মুজিবসহ অন্যান্যদের মুক্তির দাবিতে নানা শ্রেণি পেশার মানুষ কাধে কাধ মিলিয়ে আন্দোলন করতে থাকে। এক পর্যায়ে 'শেখ মুজিবের মুক্তি আন্দোলন' আইয়ূব বিরোধী গণআন্দোলনে রূপ লাভ করে। আন্দোলনরত মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষনে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান, বন্দি অবস্থায় ঢাকা সেনানিবাসে এই মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহা নিহত হলে আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়। তীব্র আন্দোলন ও প্রতিবাদের মুখে সরকার ১৯৬৯ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫ জন আসামিকে নি:শর্ত মুক্তি দিয়ে আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়।

মামলার তাৎপর্য:

পরবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই প্রহসনমূলক 'আগরতলা মামলার' প্রভাব অনস্বীকার্য। আইয়ূব খান সরকার যে উদ্দেশ্যে এই প্রহসনমূলক মামলার নাটকের অবতারণা করেন তা ব্যর্থথায় পর্যবসিত হয়। একই সাথে প্রকৃতপক্ষে এই মামলাটিই যে ষড়যন্ত্রমূলক ছিল তা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট প্রকাশিত হয়ে পড়ে বিশেষ করে শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের বক্তব্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণার ফলে। মামলা প্রত্যাহারের মধ্য দিয়ে আইয়ূবখান সরকারের দুর্বলতাই প্রকাশ পায়। এমনকি গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হলে আইয়ূব খান ক্ষমতা ছাড়তে বাধ্য হন। একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ছিল আইয়ূব খানের জন্য আত্মঘাতি স্বরূপ। অন্যদিকে এই মামলার সূত্র ধরে শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিতে অবিসংবাদি ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতায় পরিণত হন। কারামুক্তি লাভের পর ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সালে তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) তাঁর জন্য এক বিশাল গণসংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠন ডাকসুর তদানীন্তন ভিপি তোফায়েল আহমেদ তার বক্তব্যে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং পরবর্তী বক্তাদের বক্তব্যে এই বিষয়টি সমর্থিত হয়। এরপর থেকে তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বা শুধু 'বঙ্গবন্ধু' নামেই জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	**আগরতলা মামলার গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখুন।**

সারসংক্ষেপ :

ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করলে সাথে সাথে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায় এবং জনগণ ব্যাপকভাবে এটিকে সমর্থন জানায়। পূর্ব বাংলার ছয়দফা কেন্দ্রিক এই আন্দোরনকে দমন করার জন্যে স্বৈরাচার আইয়ুব খান ১৯৬৮ সালে ছয় দফার রূপকার শেখ মুজিবসহ ৩৫ জনকে আসামী করে মামলা দায়ের করেন যা ইতিহাসে আগরতরা মামলা নামে পরিচিত। মামলার বিচার চলাকালে পূর্ব বাংলার মানুষ মেখ মুজিবের মুক্তি ও মামলা প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলনের ডাক দেন। এই আন্দোলনই এক সময় গণ অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। আইয়ুব সরকার মামলা প্রত্যাহারে বাধ্য হন এবং সকল আসামীদের নি:শর্ত মুক্তি দেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার প্রধান আসামী কে?
ক. শেখ মুজিবুর রহমান খ. এ কে ফজলুল হক গ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ. মাওলানা ভাসানী

২। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার করা হয় কত সালে?
ক. ১৯৬৬ খ. ১৯৬৮ গ. ১৯৫৮ ঘ. ১৯৫৬

৩। ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার আসামী সংখ্যা কত?
ক. ৩৫ খ. ২১ গ. ৩৭ ঘ. ২৫

৪। আগরতলা মামলায় আসামী পক্ষের প্রধান আইনজীবী কে?
ক. টমাস ফেডারিক খ. টমাস উইলিয়াম গ. টমাস চার্লস ঘ. খ ও গ উভয়

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

‘প’ দক্ষিণ এশিয়ার একটি মুসলিম দেশ। এটি দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটির পূর্বাংশের জাতীয়তাবাদী নেতা জনাব এম রহমান। ‘প’ এর শাসকগোষ্ঠী পূর্বাংশের বাঙালি জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘদিন ধরে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে আসছে। এই প্রেক্ষিতে জনাব এম রহমান বাঙালির স্বাধীকার ও স্বায়ত্বশাসনের জন্যে ৬টি দাবি সম্বলিত একটি কর্মসূচি ঘোষণা করেন। প এর বাঙালি জনগোষ্ঠী এটাকে তাদের প্রাণের বলে গ্রহণ করেন। অন্যদিকে ‘প’ এর শাসকগোষ্ঠী এটাকে রাষ্ট্রদ্রোহীতা বলে আখ্যায়িত করেন। ‘প’ এর স্বৈরাশাসক ‘আ’ জনাব রহমানসহ ৩৫ জনকে আসামী করে একটি ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করেন।

ক. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা কী ? ১

খ. ঐতিহাসিক আগরতলা মামলার উদ্দেশ্যগুলো লিখুন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মামলার সারকথা ও বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখুন। ৩

ঘ উদ্দীপকের আলোকে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা পরিণতি, গুরুত্ব ও প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৯.৬ ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানঃ প্রেক্ষাপট, ঘটনাপ্রবাহ ও গুরুত্ব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, স্বায়ত্বশাসন ও গণ-অভ্যুত্থান**

পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্যায়ের পূর্ব মূহুর্তে ঘটে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান। সাধারণত ঐতিহাসিক ছয় দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে আন্দোলন এবং আগরতলা মামলা পরবর্তী বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ প্রভৃতির সমন্বয়ে গণআন্দোলন আইয়ূব খান সরকারের উৎখাত আন্দোলনে রূপ নেয় যা ১৯৬৯ সালে সংগঠিত হওয়ায় ঐতিহাসিকভাবে 'ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান' নামে পরিচিত।

গণঅভ্যুত্থানের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটঃ

দেশ বিভাগের পর থেকে রাজনৈতিক সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বাঙালিরা দারুণ বৈষম্যের শিকার হয়। বাঙালির মনে দীর্ঘদিন ধরেই ক্ষোভের সঞ্চার হতে থাকে। এটিতে জ্বালানীর কাজ করে ছয়দফা ভিত্তিক আন্দোলন এবং প্রহসনমূলক আগরতলা মামলা। উল্লেখ্য যে আগরতলা মামলার আসামিদের মুক্তির আন্দোলন এক পর্যায় আইয়ূব খান সরকারের উৎখাত আন্দোলনে রূপ নেয়। বাঙালির এই আন্দোলনকে আরো বেগবান করতে পূর্ব পাকিস্তানের ৮ টি বিরোধী রাজনৈতিক দল একত্রিত হয়ে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটি' (Democratic Action Committee) সংক্ষেপে DAC নামে একটি ঐক্যজোট গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ছাত্রদের এগারো দফা আন্দোলন এটির সাথে একাত্ম হলে আন্দোলন দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলে।

আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জিঃ

জানুয়ারি, ১৯৬৯

পূর্ব পাকিস্তানের উপর নিপীড়ণ ও দমননীতির প্রতিবাদে ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের দুই গ্রুপ মিলে ৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদকে সভাপতি করে একটি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে। পরিষদের অধীনে পূর্বের এগারো দফার ভিত্তিতে একটি দাবিনামা তৈরি করা হয় এবং এর সঙ্গে ছয়দফার দাবিগুলো একীভূত করা হয়। ৮ জানুয়ারি তারিখে ৮ টি রাজনৈতিক দলের সমন্বয়ে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ' বা Democratic Action Committee বা সংক্ষেপে DAC/ডাক' গঠন করে। এই 'ডাক' এর অধীনে ১৪ জানুয়ারি সারা দেশে হরতাল পালিত হয়। ১৭ জানুয়ারি 'ডাক' এবং ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের যৌথ উদ্যোগে দেশ ব্যাপী 'দাবি দিবস' পালিত হয়। এই দিনে 'ডাক' এর অধীনে বিক্ষোভ মিছির বের করা হলে পুলিশ জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে মিছিলে লাঠি চার্জ করে। পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে পরের দিন অর্থাৎ ১৮ জানুয়ারি সারাদেশে ধর্মঘট পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৮ জানুয়ারি তারিখের ধর্মঘট সহিংসতায় রূপলাভ করলে পুলিশ বেপরোয়াভাবে ছাত্রদের মিছিলে আক্রমণ করে এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রকে গ্রেফতার করে। এই গ্রেফতার ঘটনার প্রতিবাদে আবার পরবর্তী দিন ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ১৯ জানুয়ারি তারিখে আন্দোলনরত ছাত্রদের মধ্য থেকে অনেককে গ্রেফতার করা হয়। আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ হয় ২০ জানুয়ারি সারা পূর্ব পাকিস্তানে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালনকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে বিক্ষোভরত ছাত্রদের উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করলে ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান নিহত হবার পর। আসাদের মৃত্যুর সংবাদ দাবানলের মত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে এবং এরপর থেকে প্রতিদিন লাগাতার কর্মসূচি পালিত হয়। ২২ ও ২৩ জানুয়ারি তারিখে নানা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয় এবং ২৪ জানুয়ারি দেশব্যাপি হরতাল পালন করা হয়। এদিন রাজপথে সর্বস্তরের জনগণের ঢল নামে। এত জনসমাগম দেখে পাকিস্তান সরকার দিশেহারা হয়ে পড়ে এবং পুলিশ বাহিনীকে আবারো গুলি চালানোর হুকুম দেয়। সচিবালয়ের নিকট গুলিবর্ষণের ঘটনায় এক কিশোর ছাত্র নিহত এবং বহু হতাহত হয়। এই ঘটনা আগুনে জ্বালানীর

সঞ্চালন করে। কেননা জনতা এতই ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে যে, তারা সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকা দৈনিক পাকিস্তান এবং মর্নিং নিউজ এর ভবনে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ কিছু সময়ের জন্য হলেও কেন্দ্রিয় সরকারের হাত ছাড়া হয়ে যায়। ২৫ জানুয়ারি নানা স্থানে হরতাল পালনকালে অন্তত ২ জনের প্রাণহানীর ঘটনা ঘটে। অবস্থা বেগতিক দেখে ২৬ জানুয়ারি তারিখে সান্ধ্য আইন জারী করা হয়। এমনকি এই দিনেও সেনাবাহিনীর গুলিতে ৩ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। এভাবে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত সারাদেশে মিছিল-মিটিং, বিক্ষোভ সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি পালন করা হয়।

ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯:

১৯৬৯ সালের উত্তাল জানুয়ারির মতই ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধ হরতাল বিক্ষোভ সমাবেশ ও নানা কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় এই পূর্ব পাকিস্তানে। বিশেষ করে ১, ৬, ৯, ১২ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি এরকম কর্মসূচি চলাকালে বহু লোকের হতাহতের খবর পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ঘটে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর ঘটনা। এদিন আগরতলা মামলার অন্যতম আসামি সার্জেন্ট জহুরুল হককে জেল খানায় গুলি করে হত্যা করা হয় এবং একই ঘটনায় অপর আসামি সার্জেন্ট ফজলুল হক আহত হন। জহুরুল হকের হত্যার প্রতিবাদে ১৬ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী আন্দোলন অগ্নিরূপ ধারণ করে। জনতা তাদের ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটায় এই মামলার প্রধান বিচারপতির বাসভবনে অগ্নি সংযোগের মাধ্যমে। পূর্ব পাকিস্তান সরকার অবস্থা বেগতিক দেখে ‘সান্ধ্য আইন’ জারি করে এবং তা ১৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বলবৎ রাখে। আরেকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করা হয় এবং আরো অনেক ছাত্র ও শিক্ষক আহত হন। ফলে দেশের সামগ্রিক আইন শৃংঙ্খলার দ্রুত অবনতি ঘটে। এতে করে আইয়ুব খান সরকার কিছুটা হলেও ভীত হয়ে পড়ে এবং বিরোধী দলগুলোর সাথে গোল টেবিল বৈঠকের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তৎকালীন নেতারা তা প্রত্যাখ্যান করে।

এ অবস্থায় নেতারা সরকারকে অসহযোগিতা করার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। অসহযোগিতার ফলে দেশের অবস্থা আরো অবনতি হতে থাকে। আইয়ুব খান উপলব্ধি কারণ য়ে , মামলা প্রত্যাহার ব্যতিরেকে আর কোন উপায় নেই । তাই তিনি ২১ ফেব্রুয়ারি তারিখে এক বেতার ভাষণে ঘোষণা দেন যে, পরবর্তী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তিনি আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। তার ঘোষণা অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য আসামিদের মুক্তি দেওয়া হয় ২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে। কারামুক্তির পরের দিন (২৩ ফেব্রুয়ারি) শেখ মুজিবুর রহমানের জন্য এক বিশাল গণ সংবর্ধনা অনুষ্ঠনের আয়োজন করা হয় এবং সেই অনুষ্ঠানে ছাত্র নেতা তোফায়েল আহমেদ তাঁকে ‘বঙ্গবন্ধু’ উপাধিতে ভূষিত করেন। ২৩ ফেব্রুয়ারির জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্রদের ১১ দফার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান এবং ৬ দফা ও ১১ দফা অর্জনে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেন। মামলা প্রত্যাহারের পর ২৬ ফেব্রুয়ারি আইয়ুব খান পাকিস্তানের উভয় অংশের নেতাদের নিয়ে গোল টেবিল বৈঠকের আয়োজন করেন। এই বৈঠকেও বঙ্গবন্ধু তার ঘোষিত ৬ দফা এবং ১১ দফা আদায়ের লক্ষ্যে তার অবস্থান পুনরায় ব্যক্ত করেন। আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও ব্যাপক আকার ধারণ করতে থাকে। ফলে আইয়ুব খানের স্বপদে বহাল থাকা কঠিন হয়ে ওঠে।

মার্চ ১৯৬৯:

মার্চ মাসে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন পাকিস্তানের দুই অংশে ব্যাপকতর রূপ লাভ করলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আরো কিছুদিন ক্ষমতায় থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তবে ১০ মার্চের গোল টেবিল বৈঠকে আইয়ুব খান অগত্যা পার্লামেন্টারী পদ্ধতি প্রবর্তন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচনের ঘোষণা দেন। কিন্তু এবারের বৈঠকেও শেখ মুজিবুর রহমান তার ৬ দফার প্রশ্নে অটল থাকেন। এভাবে নানা আলপ-আলোচনা চলতে থাকে এবং কোন প্রকার উপায় না দেখে আইয়ুব খান দেশ পরিচালনায় তার অপারগতার কথা স্বীকার করেন এবং ২২ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট ক্ষমতা অর্পন করেন। জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর মোনায়েম খানকে অপসারণ করে তদস্থলে এম এন হুদাকে গভর্ণর নিয়োগ করেন। ফলে গোলযোগ আরো বৃদ্ধি পায়।

গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব:

১। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের সরাসরি প্রভাব হলো- স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুব খানের পতন। আইয়ুবখান সরকার এই আন্দোলন দমনে ব্যর্থ হন। কারণ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ এতে অংশ নেয় এবং আর সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রক্টর ড. শামসুজ্জোহাকে হত্যা করা হলে অবস্থা আরো খারাপ হয়। যা আন্দোলনে নতুন রূপদান করে। ফলে শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

২। এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যার উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দাওয়া আদায়ের মূর্ত প্রতীক শেখ মুজিবুর রহমানকে দমনের মাধ্যমে এই অঞ্চলের স্বাধীকার দাবি আন্দোলন চিরতরে দমন করা। কিন্তু ইতিহাস চিরদিন শাসকের পক্ষে লেখা হলেও নির্যাতন ও নিপীড়ণকারী এবং শাসনের নামে শোষণকারী বরাবরই আস্তাকূঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হয়নি, যে উদ্দেশ্যে মামলা করা হয়েছিল তা তো সফলতা পায়নি, বরং উল্টো মামলার উদ্যোক্তা আউয়ুব খানকেই ক্ষমতা ত্যাগে বাধ্য হতে হয়েছিল।

৩। এই আন্দোলনের অন্যতম সাফল্য হলো সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা এবং সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের স্বীকৃতি লাভ।

৪। এই আন্দোলনের মাধ্যমে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে বাঙালিদের যে জাতীয়তাবোধ ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের মধ্যদিয়ে জাগ্রত হয়েছিল তার পূর্ণতা পায়।

৫। এই আন্দোলনে সফলতা পাওয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এবং নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু আলাদা রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন তা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

৬। এই গণঅভ্যুত্থানে বিজয়ের মাধ্যমে বাঙালিদের জাতীয় চেতনার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটির দিন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ঐতিহাসিক ছয় দফা আন্দোলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখুন।

সারসংক্ষেপ :

ঐতিহাসিক উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থনের পটভূমি রচিত হতে থাকে ১৯৪৭সালের পর থেকেই। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা ঘোষণা করলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাঁকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং ১৯৬৮ সালে তাঁকে প্রধান আসামী করে আগরতলা মামলা দা য়ের করে। এই মামলা পূর্ব বাংলার ছাত্র আন্দোলনকে পুনরায় বেগবান করে। এই আন্দোলন শেষ পর্যন্ত কেবল ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি তা বাংলার কৃষক,শ্রমিকসহ সর্ব সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রথম আইয়ুব খানের পতনকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানের দু'অংশের মানুষ একযোগে মাঠে নামে। এই গণঅভ্যুত্থানে আইয়ুব খানের পতন ঘটে এবং বাঙালিরা স্বাধীনতার পথে আরেক ধাপ এগিয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ফলে কার পতন ঘটে?
ক. আইয়ুব খানের খ. ইয়াহিয়া খানের
গ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ. খাজা নাজিমুদ্দিনের

২। কয়টি দলের সমন্বয়ে 'ডাক' গঠিত হয়?
ক. ৮ খ. ১৯ গ. ১০ ঘ. ১৫

৩। ছাত্রনেতা আসাদুজ্জামান কত তারিখে নিহত হন?
ক. ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি খ. ১৯৬৯ সালের ২২ জানুয়ারি
গ. ১৯৬৯ সালের ১৯ জানুয়ারি ঘ. ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি

৪। শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়-
ক. ১৯৬৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি খ. ১৯৬৯ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি
গ. ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ঘ. ১৯৬৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

জনাব সফিক সাহেব তার কন্যা প্রিয়ন্তিকে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস বলছিলেন। পিয়ন্তি তার বাবার কাছে জানতে চাইল কেন বাঙালিরা পাকিস্তানি শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন শুরু করলেন? তার বাবা বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের শাসন শোষন ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বাঙালিরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে গণ আন্দোলনে ঝাপিয়ে পরে।

ক. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান কী? ১

খ. উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পর্যায়গুলো লিখুন? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের পটভূমি এবং ঘটনা লিখুন। ৩

ঘ উদ্দীপকের আলোকে উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৯.৭ সত্তরের জাতীয় নির্বাচন

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সত্তরের জাতীয় নির্বাচন সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন;
- সত্তরের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন

	মূখ্য শব্দ	**ছয় দফা, স্বায়ত্বশাসন, তফসিল , নৌকা প্রতীক ও নির্বাচনী ইস্তেহার**

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে অন্যতম যুগান্তকারী ঘটনা। স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর এটি ছিল মাত্র দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন। এই নির্বাচনে বিজয়ী হবার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ যে জনগণের দলে পরিণত হয়েছে তা নিশ্চিত হয়। এই নির্বাচনে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে একাধিক রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করলেও কেন্দ্রিয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী লীগ নিরংকুশ বিজয় লাভ করে। নানা কারণে এই বিজয় ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এই নির্বাচনের ফলাফলের ভিত্তিতে একদিকে পাকিস্তানি শাসকবর্গ পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাঁদের কর্তৃত্বের বৈধতা হারায় অপরদিকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পথ প্রশস্ত হয়।

নির্বাচনের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব অপরিসীম। এই লাহোর প্রস্তাবের ধারার উপর ভিত্তি করেই জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের। কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, ১৯৪০ সালের প্রস্তাবনার আরেকটি ধারায় প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের কথা উল্লেখ থাকলেও পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী স্বায়ত্বশাসনের প্রশ্নে সবসময়ই বিমাতাসুলভ নীতি অবলম্বন করেছে। এমনকি দেশ পরিচালনার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সংবিধান প্রণয়ন করতেও তারা দীর্ঘ এক দশক কালক্ষেপণ করেছে। পাকিস্তানে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। নির্বাচনের ফলাফলে দেখা যায় মুসলিম লীগের ভরাডুবির পাশাপাশি যুক্তফ্রন্ট বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়। নির্বাচনের ফলাফলে হতাশ হলেও যুক্তফ্রন্টকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দিতে বাধ্য হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক মন্ত্রিসভা বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে করে প্রদেশগুলো আবার গভর্ণরের শাসনাধীনে চলে যায়। ১৯৫৬ সালে রচিত হয় পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান। এতে প্রদেশের স্বায়ত্বশাসনের কথা নামমাত্র দেওয়া হয়। কিন্তু অনেক প্রত্যাশিত এই সংবিধান কার্যকরের মাত্র দুই বছরের মধ্যেই অর্থাৎ ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে জেনারেল আইয়ূব খান ক্ষমতা দখল করে সামরিক শাসন জারি করেন এবং সংবিধান ও সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। এরপর থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত চলে সামরিক শাসন। এই সময়কালে দুইবার (১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে) বিরোধী দলবিহীন এবং ১৯৬৪ সালে সর্বদলীয় নির্বাচনের আয়োজন করেছিল আইয়ূব খান সরকার। কিন্তু সে নির্বাচনে সকলের ভোটাধিকার ছিল না। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানোর জন্য ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ছয়দফা ঘোষণা করেন। এর দাবিগুলো জনগণের প্রাণের দাবি হওয়ায় সর্বস্তরের জনগণ এতে সমর্থন জানায়। শেখ মুজিবুরের প্রতি জনসমর্থনের ঢল দেখে ভীত সন্ত্রস্ত্র হয়ে তাকে দমন করতে সরকার ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা নাটক মঞ্চস্থ করে। কিন্তু জনগণ সরকারের কুমতলব বুঝতে পারে এবং শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য রাজবন্দীদের মুক্তির দাবিতে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। সেই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনতে না পেরে আইয়ুব খান সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা গ্রহণ করেই ঘোষণা দেন যে, ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাসের মধ্যেই নির্বাচনের আয়োজন করা হবে এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। তিনি ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ এসংক্রান্ত একটি দিকনির্দেশনামূলক আইন জারি করেন। যেখানে উল্লেখ করা হয়-

১. প্রাদেশিক ব্যবস্থা পুন:প্রতিষ্ঠা করা হবে।

২. এক ব্যক্তি এক ভোট নীতিতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে জাতীয় ও প্রাদেশিক প্রতিনিধি নির্বাচন দেওয়া হবে।

৩. পাকিস্তানের উভয় অংশের আইন ও অর্থনীতি বিষয়ক সম্পর্ক নির্ধারণ করবেন নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ। তবে জাতীয় ঐক্য নিশ্চিত করতে হবে।

৪. ১৯৭০ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হবে।

৫. জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন থেকে ১২০ কর্মদিবসের মধ্যে নতুন সংবিধান তৈরি করতে হবে। এসময় অতিক্রান্ত হলে পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে সংবিধানে ছয়টি বিষয় অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে। যথা:

(ক) ফেডারেল পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

(খ) রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে ইসলামী আদর্শ।

(গ) নির্বাচনে প্রতিটি প্রদেশের জনসংখ্যার অনুপাতে জাতীয় পরিষদে প্রতিনিধি প্রাপ্ত বয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে।

(ঘ) নাগরিকের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

(ঙ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিটি প্রদেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূরীকরণে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

(চ) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৬. নববর্ষের দিন থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা যাবে এবং আচরণবিধি দু'দিন পর ঘোষিত হবে।

৭. জাতীয় পরিষদের নির্বাচনী আসন হবে সর্বমোট ৩১৩ টি। যেখানে ১৩ টি মহিলা আসন থাকবে। আর পাঁচটি প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হবে। যেখানে ৬২১ টি আসনের বিপরীতে প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। অর্থাৎ-

অঞ্চল	জাতীয় পরিষদ			প্রাদেশিক পরিষদ		
	সাধারণ	মহিলা	মোট	সাধারণ	মহিলা	মোট
পূর্ব পাকিস্তান	১৬২	৭	১৬৯	৩০০	১০	৩১০
পাঞ্জাব	৮২	৩	৮৫	১৮০	৬	১৮৬
সিন্ধু	২৭	১	২৮	৬০	২	৬২
উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত	১৮	১	১৯	৪০	২	৪২
বেলুচিস্তান	৪	১	৫	২০	১	২১
কেন্দ্র শাসিত এলাকা	৭	-	৭	-	-	-
সর্বমোট	৩০০	১৩	৩১৩	৬০০	২১	৬২১

৮. প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবে সাধারণ আসনগুলোর সদস্যগণ এবং তবে মহিলা আসনগুলোতে মহিলা প্রার্থী নির্বাচিত হবে শুধুমাত্র সাধারণ আসনের নির্বাচিত সদস্যদের ভোটে।

৮. কেন্দ্র শাসিত এলাকার নির্বাচন সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রনয়ন করার ক্ষমতা থাকবে রাষ্ট্রপতির হাতে।

৯. জাতীয় পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকবে সংবিধান বিল পাশ করার ক্ষমতা।

তবে নির্বাচনের সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করতে একটু বেশি সময় লেগে যায় এবং ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর তারিখে প্রাদেশিক নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের ৯ টি আসন ব্যতিত (এই আসনগুলোতে ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়) সমগ্র পাকিস্তানে নির্ধারিত দিনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন কমিশন ও অন্যান্য কার্যাবলি:

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান দেশে বিরাজমান অস্থিরতা দূরীকরণে সাধারণ নির্বাচনের বিকল্প কিছু ভাবতে পারেননি। এ কারণে তিনি অচিরেই একটি সুষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের ঘোষণা দেন এবং নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। এরই অংশ হিসেবে ১৯৬৯ সালের ২৮ জুলাই একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। কমিশনের প্রধান নিযুক্ত হন তৎকালীন পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের একজন বাঙালি বিচারপতি আবদুস সাত্তার।

রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মতৎপরতা:

১৯৭০ সালে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে সমগ্র পাকিস্তানে প্রাণ সঞ্চার হয়। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সমমনা কিছু দল ঐক্যজোটের মাধ্যমে নির্বাচনে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও শেখ মুজিবুর রহমান প্রত্যাখ্যান করায় তা সফল হয়নি। ফলে নতুন বা পুরাতন সব রাজনৈতিক দল আলাদা প্রার্থীর মাধ্যমে নির্বাচনে যায়। নির্বাচনে মোট ২৪ টি রাজনৈতিক দল অংশগ্রহণ করেছিল। এই নির্বাচনে প্রথমবারের মত রেডিও বা টেলিভিশনে প্রচারকার্য চালানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ ব্যাপক প্রাধান্য লাভ করে। দলটি ‘নৌকা’ প্রতীক নিয়ে তার প্রচারাভিযান আরম্ভ করে। তাদের মূলমন্ত্র ছিল ছয় দফার বাস্তবায়ন। দলটির প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতায় বারংবার উচ্চারিত হয় এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের দলগুলোর মধ্যে পাকিস্তান পিপল্স পার্টির জনপ্রিয়তা ব্যাপক ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। প্রচারাভিযানে তাদের স্লোগান ছিল, “ইসলাম হচ্ছে আমাদের বিশ্বাস, গণতন্ত্র আমাদের নীতি এবং সমাজতন্ত্র হচ্ছে আমাদের অর্থনীতি।” এদলটির প্রধান ছিলেন জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি শেখ মুজিবুরের জনপ্রিয়তা দেখে ভীত হন এবং কৌশলে তাকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেন। তিনি অপপ্রচার চালাতে থাকেন যে, ছয়দফা হলো পাকিস্তানের জাতীয়তার জন্য আঘাত স্বরূপ। নির্বাচনের প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে জলচ্ছ্বাস দেখা দিলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির দিক বিবেচনা করে মাওলানা ভাসানীসহ অন্যান্য নেতারা নির্বাচন পেছানোর দাবি করলেও শেখ মুজিবুর রহমান ও তার দল যথা সময়ে নির্বাচনের দাবিতে অটল থাকেন। আওয়ামী নেতারা প্রচার করেন যে, এই নির্বাচন এখন বাতিল করা হলে পশ্চিম পাকিস্তানিরা আবার অন্য কুটকৌশল চালাতে পারে। তারা আরো বলে যে, যে সমস্ত এলাকায় নির্বাচন আয়োজন সম্ভব নয় সেখানে পরিবর্তিত তারিখে নির্বাচন হতে পারে তাই বলে সারাদেশে নির্বাচন হতে হবে। ফলে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পেছানোর কথা দ্বিতীয় বার ভাবেনি। যাই হোক ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রিয় পরিষদ এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এক নজরে ১৯৭০ সালের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল

দলের নাম	সাধারণ আসন (৩০০)	মহিলা আসন (১৩)	মোট
আওয়ামী লীগ	১৬০	০৭	১৬৭
পাকিস্তান পিপল্স পার্টি	৮১	০৫	৮৬
মুসলিম লীগ (কাইয়ূম)	৯	-	৯
মুসলিম লীগ (কাউন্সিল)	৭	-	৭
জমিয়ত-উ-উলেমা-ই-ইসলাম (হাজারভী)	৭	-	৭
মারকাজ-ই-জমিয়ত-ই-ইসলাম	৭	-	৭
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ওয়ালী)	৬	০১	৭
জামায়াত-ই-ইসলামী	৪	-	৪
মুসলিম লীগ (কনভেনশন)	২	-	২
পাকিস্তান ডেমোক্রাটিক পার্টি	১	-	১
স্বতন্ত্র	১৬	-	১৬

উল্লেখ্য যে, আওয়ামী লীগ শুধু পূর্ব পাকিস্তানে মাত্র দুটি আসন (ডেমোক্রাটিক পার্টি ১টি ও স্বতন্ত্র ১টি) বাদে অন্য সব আসনে জয়ী হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ আসন জয়ী দল পাকিস্তান পিপল্স পার্টি পূর্ব পাকিস্তানে কোন আসন না পেলেও পাঞ্জাবে ৬৪ টি, সিন্ধুতে ১৮ টি এবং উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ১টি আসনে জয়ী হয়।

পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক নির্বাচনের ৩০০ আসনের ফলাফল:

১. আওয়ামী লীগ ২৮৮ টি
২. পি. ডি. পি ২ টি
৩. জমিয়তে ইসলাম ০
৪. উলেমা ই ইসলাম ১

৫.	নেজামে ইসলাম	০
৬.	জামায়াতে ইসলাম	১
৭.	ন্যাপ (ওয়ালী)	১
৮.	স্বতন্ত্র	৭

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুলভোটে বিজয়ের কারণ:

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ছিল আওয়ামী লীগের বিজয়ের অন্যতম কারণ। কেননা নির্বাচনের আগে থেকেই শেখ মুজিবুর রহমান এদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। এ কারণেই আওয়ামী লীগ তার সমমনা দলগুলোর ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করে পৃথকভাবে সবকয়টি আসনে প্রার্থী মনোনয়ন দেবার দুঃসাহস দেখাতে পেরেছিল। ছয় দফা ভিত্তিক ইশতেহার প্রণয়ন ছিল আরেকটি কারণ। যেখানে পূর্ব পাকিসক্তানের জনগণ তাদের নির্যাতন নিপীড়ণের থেকে মুক্তির সুবাতাস দেখতে পাচ্ছিল। ইতিপূর্বে ছাত্রদের এগারো দফা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক সমর্থিত হওয়ায় ছাত্ররাও শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং প্রচারাভিযানে তারাও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের বিজয় সময়ের দাবিতে পরিণত হয়।

নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য:

ক. এই নির্বাচনে বিপুলভোটে বিজয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি এ দেশের আপামর জনতার অকুণ্ঠ সমর্থন এবং ভালোবাসার বহি:প্রকাশ ঘটে। ইতোপূর্বে তার ঘোষিত ঐতিহাসিক ছয় দফা প্রকৃত অর্থেই এদেশের মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছিল তা এই নির্বাচনী ফলাফলের মাধ্যমে প্রমাণিত।

খ. শাসনতান্ত্রিক অবকাঠামোতে জনগণের ভূমিকা আরেক বার জোরেশোরে প্রকাশ পায়। এই নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীকে জানান দেয় যে, তারা তাদের অধিকার আন্দোলন সংগ্রামের মাধ্যমেই আদায় করে নিতে প্রস্তুত আছে। জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানিদের দল বিশেষ করে পি. পি. পি কে একটি আসনেও জয়ী হতে দেয়নি এটি তার বড় প্রমাণ।

গ. এই নির্বাচনের মাধ্যমে বাঙালিরা জাতীয়তাবোধে দারুণভাবে উজ্জীবিত হয়। দিন মজুর থেকে শুরু করে সরকারি কর্মকর্তাদের মাঝেও সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক মুক্তির কামনা জেগে ওঠে। এভাবে তারা নিজেদের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়।

ঘ. এই নির্বাচন বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে সংগঠিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল। কেননা নির্বাচনে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে কালবিলম্ব করতে দেখে শেখ মুজিবুর রহমান তাদের খারাপ উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল যাতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করেছিল।

ঙ. বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে এই নির্বাচনের প্রভাব অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। কেননা জনগণ শাসনতান্ত্রিকভাবেই তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় নির্বাচনে বিপুলভোটে আওয়ামী লীগকে জয়ী করে। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সে আশা পূরণ হতে দেয়নি। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা ছাড়তে গড়িমসি করে এবং নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখতে তারা নানা কৌশল অবলম্বন করতে থাকে। ফলে উপায়ন্তর না দেখে সেই ১৯৫২ সালের ভাষা সংগ্রামের জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অবিসংবাদী নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে বাঙালিরা যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে এবং দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ করে বিজয় ছিনিয়ে আনে।

শিক্ষার্থীর কাজ	**১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন।**

সারসংক্ষেপ :

১৯৭০ সালের নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। এই নির্বাচনের জন্য ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন এবং পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের একজন বাঙালি বিচারকের নেতৃত্বে একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করেন। এই নির্বাচনে ২৪টি রাজনৈতিক দল অংশ গ্রহণ করে। নির্বাচনে

তাঁর দল প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান নৌকা প্রতীক নিয়ে ছয় দফার পক্ষে প্রচারে নামেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকবর্গ নির্বাচনে বিজয়ী আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে শুরু হয় অসহযোগ আন্দোলন এবং মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদেরই বিজয় হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে মোট কতটি দল অংশ গ্রহণ করে?
   ক) ২৩ খ) ১৮ গ) ২৪ ঘ) ১০
২. এই নির্বাচনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে ছিলেন?
   ক) বিচারপতি আবদুস সাত্তার খ) মো.নুরুল আমিন গ) মোনায়েম খান ঘ) এম এন হুদা
৩. এই নির্বাচনে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে?
   ক) আওয়ামী লীগ খ) মুসলিম লীগ গ) পিপিপি ঘ) মুসলিম লীগ(কনভেনশন)

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

‘ক’ একটি স্বাধীন মুসলিম দেশ। দেশটি পূর্ব ও পশ্চিম এই দু’অংশে বিভক্ত। দেশটির মধ্যে দুটি প্রধান জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলমান। একটি পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হল। নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত এবং সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

ক. সত্তর সালের নির্বাচন কী? ১
খ. নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর নাম লিখুন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সত্তর সালের নির্বাচনের পটভূমি ও ঘটনা লিখুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে সত্তর সালের নির্বাচনের গুরুত্ব আলোচনা করুন? ৪

পাঠ-৯.৮ বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন ও
- বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

মূখ্য শব্দ	অসহযোগ আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও স্বাধীনতার ঘোষণা

ভূমিকা: বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল বাঙালি জাতির ইতিহাসের অসামান্য ও অপরিহার্য এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি, বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বাগ্মিতার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষকে আবিষ্ট ও সম্মোহিত করে রাখতে পারতেন। বাঙালির ক্ষোভ, অহংবোধ, সংযম, স্বপ্ন প্রতিরোধ, সংকল্প সবকিছুই আর্কেস্টার মতো বেজে উঠেছিল বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ ভাষণে। স্বাধীনতা পূর্ব এবং স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বাঙালি জাতির উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু অসংখ্য ভাষণ প্রদান করেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা পূর্ব ভাষণগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষণ **১৯৭১** সালের ৭ই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রদত্ত ভাষণ। এই ভাষণের মাধমে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে বাঙালি জাতির প্রতি স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মূলত, বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন এবং পরে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়েই বাঙালি জাতি ছিনিয়ে এনেছিল তাদের বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। ২০১৮ জাতিসংঘের সামাজিক সংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো এই ভাষণকে 'বিশ্বের ঐতিহ্যবাহী দলিল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

প্রেক্ষাপট

বঙ্গবন্ধু **১৯৭১** সালে ৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) ভাষণ ছিল সময়ের দাবি। **১৯৭০** সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও পাকিস্তানের সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে গড়িমসি শুরু করেন। ফলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এক ধরণের ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। এই ক্ষোভ ও অনিশ্চয়তা আরো প্রকট আকার ধারণ করে **১** মার্চ **১৯৭১**, যখন ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলেন। প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করার সাথে সাথে বাংলাদেশের ছাত্র সমাজ, শ্রমিক, সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিসহ সাধারণ মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। পাকিস্তানি সেনারা বিভিন্ন জায়গায় সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের মুখে পড়েন। এ ধরণের সংঘর্ষে বহু হতাহতের ঘটনা ঘটে। ঐ দিনই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে ছাত্রলীগ সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম সিদ্দিকী ও শাহজাহান সিরাজ এবং ডাকসুর সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আসম আবদুর রব ও আবদুল কুদ্দুস মাখন- এ চার নেতা মিলে এক বৈঠকে 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করেন। নব গঠিত এই সংগঠনের উদ্যোগে ২ মার্চ সারাদেশে ধর্মঘট পালিত হয় এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা ভবন প্রাঙ্গণে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়, এই সমাবেশ থেকেই কলা ভবনের গাড়ী বারান্দার উপর থেকে সর্ব প্রথম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। ৩ মার্চ পল্টন ময়দানে ছাত্রলীগ আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। এই সমাবেশ থেকে 'স্বাধীনতার ইশতেহার' ঘোষণা করা হয় এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ ঘোষণা করা হয়।

পল্টনের এই সমাবেশ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, ৪ মার্চ থেকে ৬ মার্চ পর্যন্ত প্রতিদিন অর্ধবেলা হরতাল পালন করা হবে। ছাত্রলীগের এই কর্মসূচির সাথে আপামর জনসাধারণ একাত্মতা ঘোষণা করে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও অফিস-আদালত ত্যাগ করে কর্মসূচিতে যোগ দেয়। এই তিনদিনের হরতালে ঢাকাসহ সারাদেশে আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে ইয়াহিয়া খান নতুন করে ২৫ মার্চ তারিখে অধিবেশন আহ্বানের ঘোষণা দেন। কিন্তু এই ঘোষণা বাংলাদেশের বিক্ষুব্ধ জনতাকে আশ্বস্ত এবং শান্ত করতে পারেনি। এমনকি বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও এই ঘোষণায় আস্থা রাখতে পারেননি। ফলে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বৃহত্তর কর্মসূচি ঘোষণার জন্যে জনসভা আহ্বান করা হয়।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের বিশ্ব স্বীকৃতি:

বিশ্ব ইতিহাসে যে ভাষণগুলো বিখ্যাত হয়ে আছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের এই ভাষণটি সেগুলোর অন্যতম। বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ Jacob F. Field এর বিশ্বসেরা ভাষণ নিয়ে লেখা *"We shall Fight on the Beaches: The Speeches That Inspired History"* শীর্ষক গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণটি স্থান পেয়েছে। কেবল তাই নয়, ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ইউনেস্কো ভাষণটিকে World's Documentary Heritage এর মর্যাদা দিয়ে International Memory of the World Register-এ অর্ন্তভুক্ত করেছে। বাঙালি জাতি হিসেবে এটি আমাদের অনেক বড় অর্জন।

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ:

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ অপরাহ্নে বঙ্গবন্ধু সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে হাজির হলেন রেসকোর্স ময়দানে। বাংলাদেশের প্রখ্যাত কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর, 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' শীর্ষক কবিতায় লিখেছেন,.. কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন। তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল, হৃদয়ে লাগিল দোলা, জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল দোয়ার খোলা। কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী? গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর অমর কবিতাখানি: 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।' সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের।

বঙ্গবন্ধু মঞ্চে দাঁড়িয়ে শুরু করলেন এভাবে, ভায়েরা আমার, আজ দু:খ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুখের বিষয় আজ ঢাকা, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভায়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ আজ তার অধিকার চায়। ..... ভাষণের শেষ অংশে এসে বঙ্গবন্ধু দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, ভায়েরা আমার, ... প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, প্রত্যেক ইউনিয়নে, প্রত্যেক সাবডিভিশনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল এবং তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা , রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেবো। এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ

৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের গুরুত্ব:

সমসাময়িক উত্তাল রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বাঙালির গণচেতনার নিরিখে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ ছিল বাংলাদেশের মহান মুক্তিসংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণাদায়ক ও দিকনির্দেশনামূলক। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু একদিকে পাকিস্তানি শাসকদের শোষণ আর ষড়যন্ত্রের ইতিহাস সভায় উপস্থিত জনগণের সামনে তুলে ধরেন, অপরদিকে মুক্তির সংগ্রাম ও অসহযোগের ডাক দেন। তাঁর বক্তব্যে মূল বিষয় ছিল ৪টি। যথা-ক) চলমান সামরিক আইন প্রত্যাহার খ) সৈন্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া গ) গণহত্যার তদন্ত করা এবং ঘ) নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস হলেও মূলত ৭ই মার্চ থেকেই বাঙালিরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে থাকে। স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে অসীম সাহসিকতার

সাথে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বজ্রকণ্ঠে যে ভাষণ প্রদান করেন তা বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ। মূলত সাতই মার্চের ভাষণের পর থেকেই বাঙালি সৈন্যরা যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে অন্যদিকে পাকিস্তানি শাসকরা নতুন করে হত্যা ও নির্যাতনের পরিকল্পনা নিয়ে জেনারেল টিক্কা খানকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করেন। শুরু হয় বাঙালিদের প্রতি অত্যাচার ও নির্যাতন যার চূড়ান্ত পর্ব সংঘটিত হয় ২৫ মার্চ কালরাতে 'অপারেশন সার্চ লাইটের' মাধ্যমে। সুতরাং সাতই মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে বিবেচিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	**বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ গুরুত্ব ও তাৎপর্য লিখুন।**

সারসংক্ষেপ :

বঙ্গবন্ধুর সাতই মার্চের ভাষণ বাঙালি জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের দিকনির্দেশনা। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা পূর্ব ভাষণগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষণ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চে প্রদত্ত ভাষণ। এই ভাষণের মাধমে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির প্রতি স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাক দেন। মূলত, বঙ্গবন্ধু ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ থেকে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রথমে অসহযোগ আন্দোলন এবং পরে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ কথা দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে উদ্দীপ্ত হয়ে বাঙালি জাতি ছিনিয়ে এনেছিল তাদের বহুল আকাঙ্খিত ও মূল্যবান স্বধীনতা। এ কারণেই ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণকে 'মেমোরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৮

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণটি কে প্রদান করেন?
ক. আইয়ুব খান খ. ইয়াহিয়া খান গ. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঘ. বঙ্গবন্ধু

২। ভাষণটির ব্যাপ্তি কতটুকু?
ক. ৮ মিনিট খ. ১৯ মিনিট গ. ১৭ মিনিট ঘ. খ ও গ উভয়

৩। কত তারিখে ৭ই মার্চের ভাষণটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে?
ক. ১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি খ. ২০১৭ সালের ২২ অক্টোবর
গ. ২০১৭ সালের ৩০ অক্টোবর ঘ. ২০১৭ সালের ২৪ জানুয়ারি

৪। বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ই মার্চে ভাষণ নিয়ে কবিতা লিখেছেন-
ক. নির্মলেন্দু গুণ খ. কবি আসাদ চৌধুরী গ. শাসমুর রহমান ঘ. কবি সামাদ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন:

'ব' দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম অধ্যুষ্যিত একটি অঞ্চল। এ অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী নেতা জনাব এম রহমান। যিনি উপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে দুই দশকেরর অধিক সময় ধরে সংগ্রাম করে চলছেন। একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁকে অসংখ্য বক্তৃতা দিতে হয়েছে। তবে স্বাধীনতার প্রাক্কালে অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ তিনি 'র' নামক ময়দানে জাতির উদ্দ্যেশে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন যা বর্তমানে বিশ্ব ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ।

ক. ৭ই মার্চের ভাষণ কে প্রদান ? ১
খ. ৭ই মার্চের ভাষণের বিশ্ব স্বীকৃতি সম্পর্কে লিখুন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ৭ই মার্চের ভাষণের পটভূমি এবং ঘটনা লিখুন। ৩
ঘ উদ্দীপকের আলোকে ৭ই মার্চের ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন। ৪

পাঠ-৯.৯ মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবেন ও
- উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

	মূখ্য শব্দ	**আগরতলা মামলা, গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধ**

বাঙালি জাতির জীবনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক সাংস্কৃতিক বৈষম্য দূরীকরণে তথা স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী হলেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এর ঘোষণা অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে না দিয়ে বিভিন্ন কূটকৌশল অনুসরণ করেন। ফলে বাঙালি জাতি স্বায়ত্বশাসন থেকে ক্রমান্বয়ে স্বাধীনতার দিকে ঝুকে পড়ে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের দীর্ঘদিনের লাঞ্চনা-বঞ্চনা, নির্যাতন নিপীড়ণের থেকে মুক্তির মহামাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে। কেবল তাই নয়, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক, দাবি আদায়ের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে সাড়া দিয়ে একটি স্বাধীন মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধের ময়দানে হাজির হয়। লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেখা দেয় সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত মহামুক্তি। পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় একটি স্বাধীন দেশ, বাংলাদেশ।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট:

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের চেতনার ইতিহাস রচনার বীজ বপন হয় সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। যেখানে বাঙালি জাতি প্রমাণ করেছিল রক্তের বিনিময়ে হলেও তারা তাদের দাবি আদায় থেকে পিছপা হবে না। বাঙালি জাতি তাদের আন্দোলন সংগ্রামের মূলমন্ত্র খুঁজে পায় ১৯৬৬ সালের ঐতিহাসিক ছয় দফার ভিত্তিতে। আবার ছাত্ররাও সুনির্দিষ্ট এগারো দফার ভিত্তিতে আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকে। আইয়ুব খান সরকার আগরতলা মামলার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে নেতৃত্ব শূণ্য করার অপচেষ্টা চালালে তা বাঙালিদেরকে বারুদের মত বিস্ফোরিত করে এবং ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন করতে চরমভাবে উত্তেজিত করে। বাঙালিরা বুঝতে পেরেছিল যে, বঙ্গবন্ধুকে পশ্চিম পাকিস্তানি সরকার যেকোন মূল্যেই হোক দমন করতে চাচ্ছে এবং তা বাস্তবায়িত হলে বাঙালিদেরকে আরো কিছুদিন শাসনের নামে শোষণ করা যাবে। ফলে বঙ্গবন্ধুসহ সকল আসামির মুক্তির দাবিতে সারাদেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে আইয়ুব খান সরকারের পতন ঘটায় এবং বঙ্গবন্ধুসহ সকল আসামী মুক্তি পায়। এভাবে বাঙালির অনুপ্রেরণা এবং সাহস দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে ঘিরে তারা নতুন দিনের সোনালী সূর্যের আশায় দিন গুনতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানে জনগণ এতই জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয় যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সবচেয়ে শক্তিশালী দল পাকিস্তান পিপল্স পার্টিকে তারা নির্বাচনে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ এর বিশাল বিজয় এবং পাকিস্তান পিপল্স পার্টির ভরাডুবিতে পশ্চিম পাকিস্তানিরা ভীষণভাবে শঙ্কিত হয়। এজন্য ক্ষমতা হস্তান্তর নানা প্রতারনার আশ্রয় নেয়। বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন।

৭ মার্চের ভাষণ

১৯৭০ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিশাল ব্যবধানে বিজয়ী হলেও তাদের হাতে ক্ষমতা দিতে গড়িমসি করায় অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ১৯৭১ সালের ২ ও ৩ মার্চে সারা দেশে হরতাল পালিত হয় এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিশাল জনসভায় ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। যা ছিল বাঙালি জাতির জন্য দিকনির্দেশনা মূলক একটি ভাষণ।

এই ভাষণে তিনি সর্বস্তরের জনগণকে লড়াইয়ের মাধ্যমে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করার আহবান জানান। তিনি অকুণ্ঠচিত্তে ঘোষণা করেন- .

....ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলো।
তোমাদের যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে।
এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম।
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

এই ভাষণ বাঙালি জাতির মনে চরমভাবে আশার সঞ্চারিত করে। বঙ্গবন্ধুর ঘোষণা অনুযায়ী ৮ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানের অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, যানবাহন, শিল্প কারখানা কার্যত অচল হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা বেগতিক দেখে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে আসেন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার কথা বলে কালক্ষেপণ করার বন্দোবস্ত করেন। যাতে করে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে প্রয়োজনীয় রসদ এবং অস্ত্রশস্ত্র পূর্ব পাকিস্তানে আনা যায়। তবে অন্তরে যাই থাক প্রকাশ্যে ইয়াহিয়া এবং জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুসহ অন্যান্য নেতাদের সাথে আলোচনায় বসেন ১৬ মার্চ ।

২৫ মার্চের গণহত্যা

আলোচনা কালেই ২৩ মার্চ 'পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র দিবসে' পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র বাংলাদেশের মানচিত্র খচিত পতাকা উড়ানো হয়। রাগে-ক্ষোভে ২৫ মার্চ কোন ঘোষণা না দিয়েই ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। তার নির্দেশেই বাঙালির আন্দোলন চিরতরে দমন করতে ঐদিন রাতেই ঢাকাসহ পূর্ব পাকিস্তানে নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। এই কাপুরুষোচিত অতর্কিত হামলাকে তারা নাম দিয়েছিল 'অপারেশন সার্চলাইট'। এই অপারেশনের দায়িত্বে এবং পরিকল্পনায় ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের নবনিযুক্ত গভর্ণর টিক্কা খান এবং মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। ২৫ মার্চ মধ্যরাতেই ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার খবরাখবর পেয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এই সংবাদ দ্রুত পৌঁছে যায় নেতৃবৃন্দের কাছে। এরপর ২৭ মার্চ তারিখে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে তৎকালিন মেজর জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচার করেন।

মুজিবনগর সরকার গঠন ও মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহ

২৬ মার্চ থেকেই স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে থাকে বাংলার সর্বস্তরের জনগণ। কিন্তু ঐক্যবদ্ধভাবে যুদ্ধ পরিচালনা করতে আরেকটু সময় লেগে যায় অর্থাৎ ১৫ দিন পর ১০ এপ্রিল তারিখে অস্থায়ী মুজিব নগর সরকার গঠন করা হয়। এতে শেখ মুজিবুর রহমানকে নবগঠিত সরকারের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দেওয়া হয় । তবে অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব দেওয়া হয় সৈয়দ নজরুল ইসলামকে, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান তাজউদ্দিন আহমেদ। এই সরকারের সর্বমোট সদস্য ছিল ৬ জন।

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
১.	জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি
২.	সৈয়দ নজরুল ইসলাম	উপ-রাষ্ট্রপতি
৩.	তাজউদ্দিন আহমদ	প্রধানমন্ত্রী
৪.	খন্দকার মোশতাক আহমদ	পররাষ্ট্র ও আইনমন্ত্রী
৫.	ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী	অর্থমন্ত্রী
৬.	এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান	স্বরাষ্ট্র, ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী

উপদেষ্টা পরিষদ গঠন:

রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকার গঠন করা হলে দেশের সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় অন্যান্য দলের নেতাকর্মীরা নবগঠিত এই সরকারের প্রতি সমর্থন জানায়। বিশেষ করে ন্যাপ নেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমেদ, কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি কমরেড মণি সিংহ এবং কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ। তাদের সাথে আওয়ামী লীগের আরো পাঁচজন নেতার সমন্বয়ে একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। তারা মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

বাহিনী গঠন:

অস্থায়ী সরকার মুক্তিযুদ্ধকে আরো গতিশীল এবং সুশৃঙ্খল উপায়ে পরিচালনা করার জন্য এ দেশের বিভিন্ন বাহিনীতে চাকুরিরত সেনাদের সমন্বয়ে ‘নিয়মিত বাহিনী’ এবং সাধারণ জনতার সমন্বয়ে ‘অনিয়মিত বাহিনী বা গণবাহিনী’ নামক প্রধান দুটি বাহিনী গঠন করা হয়। তবে সার্বিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের এসব বাহিনী ‘মুক্তি বাহিনী’ নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। কর্ণেল আতাউল গণি ওসমানীকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করা হয়। নিয়মিত বাহিনীর অধীনে আরো কিছু উপ বাহিনী গঠিত হয়। যথা-

ক. সেনা ব্যাটেলিয়নঃ এই বাহিনীটি গঠিত হয় তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তার রাইফেল্স বা ইপিআর এর বাঙালি সদস্যদের সমন্বয়ে। এই বাহিনীকে পরে তিনটি আলাদা ব্রিগেডে বা ফোর্সে বিভক্ত করা হয়। ব্রিগেড প্রধানগণ হলেন-

১. এস ফোর্স- মেজর শফিউল্লাহ

২. জেড ফোর্স- মেজর জিয়াউর রহমান

৩. কে ফোর্স- মেজর খালেদ মোশাররফ

খ. সেক্টর ট্রুপসঃ এই বাহিনী গঠিত হয় ইপিআর, পুলিশ এবং সামরিক বাহিনীর কিছু সদস্যদের নিয়ে। সারাদেশকে মোট ১১টি সেক্টরে বিভক্ত করে এই বাহিনীর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধে অসীম অবদান রাখা আরেকটি দল ছিল অনিয়মিত বাহিনী। দেশের আপামর জনতা কৃষক দিনমজুর থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ এই বাহিনীর অংশ ছিল বলে এরা গণবাহিনী নামে সমধিক পরিচিতি পায়। এদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দেবার পর যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠানো হত। তারা বেশিরভাগ গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করত। আবার নিয়মিত বাহিনীকে খবরাখবর, খাদ্য ও বাসস্থানের ব্যবস্থাসহ নানাবিদ কাজে সহযোগিতা করত এই বাহিনী। উল্লেখ্য যে, নিয়মিত এবং অনিয়মিত বাহিনী ছাড়াও যুদ্ধের সময় আরো কিছু বাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

বেঙ্গল লিবারেশন ফোর্স বা বি. এল. এফ এটিকে বলা হয় রাজনৈতিক সশস্ত্র বাহিনী। কেননা ছাত্র নেতা শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল ইসলাম খান প্রমুখের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের নেতা, কর্মী এবং আরো কিছু শিক্ষিত যুবকদের নিয়ে এই বাহিনী গঠিত হয়েছিল। এরা পরবর্তীতে ‘মুজিব বাহিনী’ নামেও সমধিক পরিচিতি লাভ করে।

টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনীঃ এটির প্রধান ছিলেন কাদের সিদ্দিকী। পরে যাকে ‘বঙ্গবীর’ উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এই বাহিনী গেরিলা আক্রমণ পরিচালনা করত।

ময়মনসিংহের ভালুকার আফসার বাহিনীঃ এই বাহিনীটিও গেরিলা আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এলাকায় পর্যদুস্ত করে রেখেছিল।

সেক্টরে বিভক্তকরণ:

যুদ্ধ ব্যাপকভাবে পরিচালনা করার জন্য সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানকে সর্বমোট ১১ টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়। নিম্নে সেক্টর সমূহের অধীনস্ত এলাকা এবং সময়কালসহ কমান্ডারদের একটি তালিকা দেওয়া হলো-

সেক্টর নং	কমান্ডার	দায়িত্ব পালনের সময়কাল	অধীনস্থ এলাকাসমূহ
১.	ক. মেজর জিয়াউর রহমান	এপ্রিল - জুন	সমগ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম (ফেনী নদী পর্যন্ত)
	খ. মেজর মোহাম্মদ রফিক	জুন- ডিসেম্বর	
২.	ক. মেজর খালেদ মোশররফ	এপ্রিল- সেপ্টেম্বর	ঢাকা, ফরিদপুরের কিছু অংশ, নোয়াখালী, কুমিল্লার আখাউড়া হতে ভৈরব রেললাইন
	খ. মেজর এ টি এম হায়দার	সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর	
৩.	ক. মেজর এ কে এম শফিউল্লাহ	এপ্রিল- সেপ্টেম্বর	আখাউড়া, ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকের কুমিল্লা জেলা, হবিগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ
	খ. মেজর নুরুজ্জামান	সেপ্টেম্বর- ডিসেম্বর	
৪.	মেজর সি আর দত্ত	এপ্রিল- ডিসেম্বর	বর্তমান সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চল, সিলেট-ডাউকি রোড পর্যন্ত
৫.	মেজর মীর শওকত আলী	এপ্রিল- ডিসেম্বর	সিলেট জেলার পশ্চিমাঞ্চল, ডাউকি রোড থেকে ময়মনসিংহ জেলা পর্যন্ত
৬.	উইং কমান্ডার এম বাশার	এপ্রিল- ডিসেম্বর	বর্তমান রংপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলা
৭.	ক. মেজর নাজমুল হক	এপ্রিল-আগস্ট	বর্তমান দিনাজপুর, রাজশাহী, পাবনা,

সেক্টর নং	কমান্ডার	দায়িত্ব পালনের সময়কাল	অধীনস্থ এলাকাসমূহ
	খ. মেজর কাজী নুরুজ্জামান	আগস্ট- ডিসেম্বর	বগুরা জেলা
৮.	ক. মেজর আবু উসমান চৌধুরী	এপ্রিল-আগস্ট	বর্তমান কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুরের অধিকাংশ এবং খুলনার উত্তরাঞ্চল
	খ. মেজর এম মঞ্জুর	আগস্ট- ডিসেম্বর	
৯.	ক. মেজর এম এ জলিল	এপ্রিল-ডিসেম্বরের কয়দিন	বর্তমান খুলনা জেলার দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল এবং পটুয়াখালী জেলা
	খ. মেজর জয়নাল আবেদিন	ডিসেম্বরের শেষ কয়দিন	
১০.	সংশ্লিষ্ট এলাকার কমান্ডারের অধীনে পরিচালিত	-	দেশের সমগ্র নদীপথ এলাকা বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দর এলাকা
১১.	ক. মেজর আবু তাহের	এপ্রিল-নভেম্বর	বর্তমান ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা
	খ. এম হামিদুল্লাহ	নভেম্বর-ডিসেম্বর	

বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী গঠন এবং চূড়ান্ত বিজয়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে দেশ হিসেবে ভারতের ভূমিকা অপরিসীম এবং অনস্বীকার্য ছিল। ২১ নভেম্বর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী গঠিত হলে যুদ্ধের মোড় দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। পাকিস্তানি বাহিনী ৩ ডিসেম্বর ভারত আক্রমণ করার ঘোষণা দিয়ে বিশ্ববাসীর নজর কাড়ার অপচেষ্টা চালায়। এদেশীয় মুক্তিবাহিনী এবং ভারতীয় মিত্রবাহিনীকে যৌথ কমান্ডের অধীনে আনা হয়। ৬ ডিসেম্বর তারিখে ভারত বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। যৌথ বাহিনীর সরাসরি আক্রমণে বাংলাদেশের প্রথম জেলা হিসেবে যশোর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নিকট থেকে মুক্ত করা হয়। এরপর একে একে সাতক্ষীরা, টঙ্গী, জামালপুর, সিলেট জেলা মুক্ত হতে থাকে। ময়নামতি সেনানিবাস অধিকারে এনে পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী শহর ঢাকা অবরোধের চেষ্টা চালানো হয়। ভারতের স্বীকৃতির পরই অস্থায়ী সরকারের উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ বেতার কেন্দ্র থেকে দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য আনুষ্ঠানিক ঘোষণা প্রদান করেন। ৯ ডিসেম্বরের মধ্যেই মাগুরা, ঝিনাইদাহ এবং নড়াইল যৌথ বাহিনীর অধিকারে আসে। ঢাকা আক্রমণের পূর্ব প্রস্তুতি স্বরূপ ১০ ডিসেম্বর সকল প্রকার বিমান হামলা বন্ধ রেখে বিদেশি নাগরিকদেরকে ঢাকা ত্যাগ করার নির্দেশনা জারি করা হয়। ঢাকায় আক্রমণ চালানোর মুল পরিকল্পনা করা হয় ভৈরব দখল করার পর এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, এখান থেকেই ঢাকায় আক্রমণ চালানো হবে। ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর কুষ্টিয়া , ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইল জেলা হানাদার মুক্ত হয়।

বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে এসে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এদেশীয় মিত্র আল বদর, আল শামস প্রভৃতি বাহিনীর সহযোগিতায় আরেক দফা গণহত্যা চালায় । যেখানে বাঙালিদের মেধাশূন্য করার অপচেষ্টা চালানো হয় এবং হত্যা করা হয় জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের। বিশেষ করে ১৪ ডিসেম্বর তারিখে তারা ব্যাপকভাবে শিক্ষিত শ্রেণি তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বনামধন্য অধ্যাপকদের হত্যা করে। কিন্তু ঐদিনই বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনী ঢাকার খুব নিকটে পৌঁছে গেলে হানাদার বাহিনী ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনীর অধিনায়ক লেফট্যান্যান্ট জেনারেল নিয়াজী ৯৩ হাজার সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্রসহ রেসকোর্স ময়দানে তথা বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে যৌথ বাহিনীর নিকট নিঃশর্ত আত্মসমর্থন করে। ফলে লাখো শহীদের রক্ত, হাজারো মা বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিশ্বের বুকে আনুষ্ঠানিকভাবে জন্ম নেয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পনের দৃশ্য

শিক্ষার্থীর কাজ	**১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি,ঘটনা ও ফলাফল লিখুন।**

সারসংক্ষেপ :

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর নির্বিচারে গণহত্যা চালালে অদম্য বাঙালি জাতি গণহত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় এবং বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ২৫ মার্চ গণহত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে যুদ্ধের সূচনা করেছিল ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর ২৭৬ দিন পর ৯৩ হাজার সৈন্যসহ রেসকোর্স ময়দানে তাদের আত্মসমর্পনের মাধ্যমে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। এই বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের জন্ম দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৯

বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মুক্তিযুদ্ধের স্থিতিকাল কতদিন ছিল?
ক. ৯০দিন খ. ২৭৬ দিন গ. ২৬৫ দিন ঘ. ২৩৫ দিন

২। মুক্তিযুদ্ধে কয়টি সেক্টর ছিল?
ক. ৮ খ. ১৯ গ. ১১ ঘ. ১৫

৩। কবে মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়?
ক. ১৯৭১ সালের ২০এপ্রিল খ. ১৯৭১ সালের ২২ এপ্রিল
গ. ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঘ. ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্নঃ

‘ক’ সদ্য স্বাধীন একটি মুসলিম দেশ। দেশটির মধ্যে দুটি প্রধান জাতি গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ চলমান। একটি পর্যায়ে শাসকগোষ্ঠী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের পক্ষপাতী। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হল। নির্বাচনে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উজ্জীবিত এবং সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সত্ত্বেও শাসকশ্রেণী ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা শুরু করলে মুক্তিযুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। এই যুদ্ধে শাসক শ্রেণী চরমভাবে পরাজিত হয় এবং বাংলাদেশ নামক নতুন একটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

ক. মুক্তিযুদ্ধ কী ? ১
খ. মুক্তিযুদ্ধে মোট কতটি সেক্টর ছিল লিখুন? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি লিখুন। ৩
ঘ উদ্দীপকের আলোকে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব বর্ণনা করুন। ৪

উত্তরমালা:

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ : ১. ক ২. গ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ : ১. গ ২. ক ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ : ১. খ ২. গ ৩. ঘ ৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ : ১. গ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ : ১. ক ২. খ ৩. ক ৪. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ : ১. ক ২. ক ৩. ক ৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ : ১. গ ২. ক ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৮ : ১. ঘ ২. গ ৩. গ ৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৯ : ১. গ ২. গ ৩. ঘ

মানবন্টন

এইচএসসি প্রোগ্রাম
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (দ্বিতীয় পত্র)

নম্বর বন্টন	সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের সাধারণ কাঠামো

পূর্ণমান-১০০

সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন- ৬০ নম্বর ৬×১০ = ৬০

সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৬০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর।
প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১।

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (Stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, ম্যাপ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্নের এ ৪টি অংশে মোট ১০ নম্বর (১+২+৩+৪=১০) থাকবে । প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের ধরন হবে নিম্নরূপঃ

প্রশ্নের ধরন	নম্বর
ক. জ্ঞান স্তর-	১
খ. অনুধাবন স্তর-	২
গ. প্রয়োগ দক্ষতা স্তর	৩
ঘ. উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা স্তর	৪
	মোট=১০

(খ) বহুনির্বাচনী প্রশ্ন- ৪০ নম্বর

মোট ৪০টি প্রশ্ন থাকবে। প্রতিটি প্রশ্ন ১ নম্বর। ৪০×১ = ৪০

সর্বমোট = ১০০